মণিলাল অধিকারী

শ্রীপ্রকাশ ভবন
এ ৬৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট • কলকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ, ফাল্গুন, ১৩৫৭

প্রকাশিকা :
শুক্লা দে
শ্রী প্রকাশ ভবন
এ৬৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলকাতা-১২

প্রচ্ছদ শিল্পী :
চারু খান

মুদ্রক :
পঞ্চানন চক্রবর্তী
মাহামায়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১[illegible], গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলকাতা-৬

কাজলু ও রঞ্জুকে

লাল শঙ্খ

গায়হলুদের শূন্যগায় নীলকুঠির নীল ত ইকসায়।
জল টুঙ্গিতে সেখান হতে
মাটির তলায় আধেক পথে
পাথর চাপা মৃত্যের থান হেঁয়ালি তাদিই নিশান॥

১

বন্ধু সুজিতের আবির্ভাবে তাপস চৌধুরী আনন্দমুখর হয়ে উঠল।

তাপস চৌধুরী বিখ্যাত ক্রিমিনোলজিষ্ট—অর্থাৎ কিনা অপরাধ বিজ্ঞান সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ। তাপসের মুখোমুখি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল সুজিত।

হাতের কাগজপত্র এক পাশে সরিয়ে রেখে তাপস জিজ্ঞাসা করল, এতদিন কোথায় অদৃশ্য হয়েছিলি সুজিত?

বানপ্রস্থ অবলম্বন করেছিলাম, মানে বনবাস।

অর্থাৎ তোর জঙ্গল-কুঠিতে? সেখানেই বোধ হয় অজ্ঞাতবাস করছিলি?

সুজিত বলল, ঠিক অনুমান করেছিস, জঙ্গল-কুঠিতেই এতদিন ছিলুম। তবে শুধু অজ্ঞাতবাস নয়—অজানার সন্ধানে ধ্যানমগ্ন হয়েই ছিলুম।

গাছ-গাছড়া নিয়ে তোর সেই বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলছিল ওখানে?

না।

তবে? অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করল তাপস।

গুপ্তধনের সন্ধানে। সুজিতের চোখের মণি দুটো রহস্যময় হয়ে উঠল যেন।

গুপ্তধনের সন্ধানে! আগ্রহের আতিশয্যে তাপস সোজা হয়ে বসল।

অত্যন্ত স্পষ্টকণ্ঠে সুজিত বলল, হ্যাঁ।

তাপস এবারে হেসে ফেলল। সহাস্য কণ্ঠেই বলল, গুপ্তধনের সন্ধান পেলি?

না, অত সহজে গুপ্তধনের সন্ধান পাওয়া যায় না, বন্ধু!

তবে গুপ্তধনের আশা ত্যাগ কর সুজিত! যথেষ্ট ধন-সম্পত্তি তো তোর আছে। গুপ্তধন নিয়ে আর কি হবে? গুপ্তধন গুপ্তই থাক না। কি দরকার অত হাঙ্গামায় গিয়ে?

কিন্তু একবার যখন হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়েছি—তখন পিছু হটলে চলবে না। এর শেষ দেখে তবে ছাড়ব।

গুপ্তধনের ভূত তাহলে তোর ঘাড়ে ভাল করেই চেপেছে! আর, ভূমিকার ধরণ দেখে মনে হচ্ছে, তুই যেন আমাকেও জড়াতে চাস ওর মধ্যে।

সুজিত বলল, উদ্দেশ্য তাই-ই, ও বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

দ্বারপ্রান্তে তাপসের সহকারী এবং বন্ধু মলয়কে দেখা গেল।

সুজিতকে দেখে খুশি হয়ে মলয় জিজ্ঞাসা করল, সুজিত যে! এতদিন পরে কি মনে করে? ব্যাপার কি?

ব্যাপার গুরুতর। সুজিত বলল, ব্যাপার শুনতে চাস তো বসে পড় একটা চেয়ার টেনে নিয়ে।

তোর গুপ্তধনের কথাই বল্, শুনি। তাপস চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল। সুজিত তার কাহিনী সুরু করল:

সম্প্রতি আমার জঙ্গল-কুঠিতে চুরি হয়ে গেছে। সাধারণ চুরি নয়, রীতিমত অসাধারণ চুরি বলা যায়। যাকে বলে রহস্যময় চুরি।

চুরি হয় দুদিন আগে, সন্ধ্যের পরে। বাড়ির পিছন দিকে আমার লাইব্রেরী-ঘর। সেদিন সন্ধ্যের পর আমি লাইব্রেরীতে বসে আমার পূর্বপুরুষের সঞ্চিত গুপ্তধনের রহস্যের সূত্র আবিষ্কার করবার বৃথা চেষ্টা

করছিলুম। গুপ্তধন খুঁজে বের করবার নেশা পেয়ে বসেছে যেন আমাকে! প্রায় বছর খানেক হল এই চেষ্টাই করছি আমি। একটা ছোট মেহগনি কাঠের বাক্স ছিল আমার সামনে। বাক্সে ছিল কয়েকটা পুরোনো দলিল, কিছু কাগজপত্র আর কয়েকটা টুকি-টাকি জিনিস্। গভীর মনোযোগ দিয়ে একটা পুরানো লেখা কাগজ পড়ছিলুম। এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল ভৃত্য হরিনাথ। হরিনাথের চোখে-মুখে উত্তেজনার চিহ্ন। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে—বাবু, চলুন তাড়াতাড়ি ধানের বড় গাদায় আগুন লেগেছে।

ছড়ানো জিনিসগুলো কাঠের বাক্সে রেখে বাক্সটা টেবিলের ড্রয়ারে তালাবন্ধ করে তাড়াতড়ি ছুটলুম ভৃত্য হরিনাথের পিছু-পিছু।

সত্যি, বড় ধানের গাদায় কি করে যেন আগুন লেগে গেছে। লোকজনেরা বালতি করে জল ঢাল্‌ছে। আমিও বালতি নিয়ে যোগ দিলুম ওদের সঙ্গে। প্রায় ঘণ্টা দুই পরে আগুন নিভলো। ততক্ষণে প্রচুর ক্ষতি হয়ে গেছে আমার।

অবশেষে শরীরে একরাশ ক্লান্তি নিয়ে লাইব্রেরী ঘরে ফিরে এলুম। অল্পক্ষণ বিশ্রাম করে টেবিলের ড্রয়ার খুললুম, উদ্দেশ্য—বাক্সটা বের করে আবার কাজ স্তুরু করব।

অবাক হয়ে দেখলুম টেবিলের ড্রয়ার শূন্য। বাক্সটা ড্রয়ারে নেই! মনে সন্দেহ হল, অন্য কোথাও রাখি নি তো? সারা ঘর খুঁজে দেখলুম। কিন্তু পাওয়া গেল না কোথাও।

তখনই আমার সন্দেহ হল, আমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে কেউ বাক্সটা চুরি করে নিয়ে গেছে। চোর নিশ্চয়ই আগে থেকেই লক্ষ্য করছিল সব। ধানের গাদায় আগুন লাগানোটাও নিশ্চয় তাহলে চোরেরই কারসাজি! আমরা সবাই যখন আগুন নিভোতে ব্যস্ত, সেই সুযোগে চোর বাক্সটা নিয়ে সরে পড়েছে বোধহয়।

ঘটনার বিবরণ শুনে এবং পরিণতি দেখে তাই মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক। 'তাপস মন্তব্য করল।

সুজিত কি যেন বলতে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে তাপস জিজ্ঞাসা করল, লাইব্রেরী ঘরের দরজা-জানলায় পর্দা টাঙানো ছিল নিশ্চয়ই ?

না, দোর-জানলায় পর্দা নেই, পর্দার প্রয়োজনও নেই ওখানে। সুজিত বলল। যে কেউ বাগানে লুকিয়ে থেকে স্বচ্ছন্দে লাইব্রেরী ঘরের সব কিছু দেখতে পারে। পাঁচিল টপ্‌কে বাগানে ঢোকাও এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়।

আবার এমনও তো হতে পারে, তাপস বলল, কোন এক ছিঁচ্‌কে চোরের কাণ্ড এটা। চুরির উদ্দেশ্য নিয়ে চোর ঢুকে পড়েছিল বাগানে। বাইরে অন্ধকার, বাগানে দাঁড়িয়ে খোলা জানলা দিয়ে ঘরের ভেতরের সব কিছু দেখেছিল সে। মেহগনি কাঠের বাক্সের ওপর ঝুঁকে পড়ে তুই ব্যস্ত হয়ে কি সব করছিলি আর তাই দেখে চোরের মনে হওয়া স্বাভাবিক, বাক্সটার মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও মূল্যবান জিনিস আছে। তারপর ধানের গাদায় আগুন লাগার সংবাদ পেয়ে তুই আর হরিনাথ ঘর খোলা রেখেই চলে গেলি। আর সুযোগ বুঝে চোর বাক্সটা নিয়ে পালাল। কিন্তু বাক্সে কি ছিল তা তো এখনও জানতে পারলুম না। নিশ্চয়ই কোন মূল্যবান জিনিস ছিল ?

সুজিত বলল, বাক্সের মধ্যে যে সব জিনিস ছিল, সাধারণ চোরের কাছে তার কোনই দাম নেই। একটা অনেক কালের পুরোনো ডায়েরি, অনেকদিন আগেকার লেখা একখানা জীর্ণ চিঠি আর একটা লাল শঙ্খ।

লাল শঙ্খ ! সেটা কি খুব মূল্যবান্ ? নাকি সাধারণ লাল রঙের একটা শাঁখ ?

সুজিত বলল, সাধারণ লোকের কাছে শঙ্খটার বিশেষ কোন

মূল্য নেই। বড় জোর শিল্পী বা শিল্পরসিকের চোখে ওটা হয়ত কারুশিল্পের একটা সুন্দর নিদর্শন। কিন্তু আমার কাছে ওটা অতি মূল্যবান্। ওটার একটা ইতিহাস আছে। ইতিহাস বললে হয়ত কথাটা ঠিক বলা হয় না, কিংবদন্তী! হ্যাঁ, কিংবদন্তী কথাটাই ঠিক বলা চলে এ ক্ষেত্রে। লাল শঙ্খের সম্পর্কে একটা কিংবদন্তী আছে। আর সেই কিংবদন্তীর কাহিনী অতি গোপনে চার পুরুষ ধরে শুনে আসছে আমাদের পরিবার এবং পরিবারভুক্ত ঘনিষ্ঠ পরিচিত কয়েকজন মাত্র লোক। ঐ কিংবদন্তীর মূলে সত্যিই যদি কিছু মাত্র সত্য নিহিত থাকে তাহলে শঙ্খটার দাম লক্ষ লক্ষ টাকা। কাজেই এখন বোধ হয় বুঝতে পারছিস, কেন বলছি চুরিটা সাধারণ চুরি নয়, উদ্দেশ্যমূলক চুরি! আগের থেকে মতলব এঁটে চুরি। রীতিমত রহস্যজনক ব্যাপার।

২

তাপস জিজ্ঞাসা করল, তোদের পারিবারিক গুপ্তধনের কথা—যা একটু আগে বলছিলি, তারই সঙ্গে বোধ হয় লাল শঙ্খের কিংবদন্তী জড়িত ?

সুজিত বলল, হ্যাঁ ! গুপ্তধন-রহস্যের চাবিকাটি বলতে পারিস শঙ্খটাকে।

তাপস বলল, তোর কথা যদি সত্যি বলে ধরে নেওয়া যায়, তাহলে অনুমান করা চলে—এমন একজন লোক বাক্সটা চুরি করেছে, যে নাকি শাঁখটার প্রাচীন ইতিহাস জানে। ওটা যে মূল্যবান এটুকুও তার অজানা নয়। লোকটার সঙ্গে তোদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, অন্তত তোদের পরিবারের সঙ্গে সে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত বলে মনে হচ্ছে।

সুজিত বলল, তোর অনুমান সত্যি, তাপস। বাক্সটা যে নিয়েছে, সে নিশ্চয়ই লাল শঙ্খের কিংবদন্তীর কাহিনী জানে। আমাদের পরিবারের পরিচিত কেউ একজন হবে চোরটা।

বাক্সটা চুরি করতে পারে—তোর পরিচিত মহলের এমন একজন কারুর ওপর তোর সন্দেহ হয় ?

সুজিত হেসে ফেলল। বলল, কাকে সন্দেহ করব সেটাই ঠিক বুঝে উঠতে পারছি নে, তাপস ! আমাদের পরিবারের পরিচিত মহলের কে যে শঙ্খ-রহস্য জানেন, আর কে যে জানেন না—সেটাই আমার জানা নেই।

তাপস প্রাণখোলা হাসি হেসে নিল একচোট। বলল, তাহলে অনুসন্ধানের ভারটা তো আমাকেই নিতে হয়।

খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল সুজিতের চোখের মণি দুটো। বলল, নিশ্চয়। তবে তোর অনুসন্ধানে যোগসূত্র জোগাড় করে দিয়ে তোকে সাহায্য করব আমি।

তাপসের চোখের মণি দুটোও যেন উৎসুক হয়ে উঠল। জিজ্ঞাসা করল সে, লাইব্রেরী-ঘরে চোর কি তার কোন স্মৃতিচিহ্ন রেখে গেছে?

হ্যাঁ।

কি সেটা?

একটা রুমাল। চোর রুমাল ফেলে গেছে। তাড়াতাড়িতে খেয়াল করেনি হয়ত।

রুমালটা সঙ্গে এনেছিস?

না, ওটা জঙ্গল-কুঠিতেই আছে।

বেশ, তাহলে কাল সকালেই রওনা হওয়া যাক, চল্।

জঙ্গল-কুঠিতে যেতে হয় ক্যানিং থেকে মাতলা নদী দিয়ে।

সুজিতের সাদা রঙের বোটটা দেখতে ছোটখাট নৌকোর মত, কিন্তু আসলে ওটা দ্রুতগামী মোটর-বোট। জনদশেক যাত্রী নিয়ে বোটটা স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করতে পারে।

চালকের আসনে বসল সুজিত, আর একধারে জলের ওপর পা ঝুলিয়ে বসল মলয়। যাত্রার সুরুতেই খুশি হয়ে উঠেছিল। ঘিঞ্জি সহরের বাইরে মুক্ত প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্য মুগ্ধ করে মলয়কে।

ছোট ছেলের মত নদীর জলে পা ডুবিয়ে খেলা করছিল মলয়।

মাঝ-নদীর দিকে বোটের গতি ফিরিয়ে সুজিত বলল, পা তুলে বোস্ মলয়, নইলে তোর পা দুটো কখন কোন্ মুহূর্তে দেহ ছাড়া হয়ে যাবে টেরও পাবি নে।

সভয়ে পা দুটো বোটের ওপর তুলে নিয়ে মলয় বলল, হাঙর আছে নাকি নদীতে ?

বোটের গতিবেগ বাড়িয়ে সুজিত বলল, একটা নয়—অজস্র।

দ্রুতগামী বোট দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলল। ক্রমে ইট-কাঠে গড়া ঘিঞ্জি ক্যানিং সহর দৃষ্টিসীমার বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল। চোখের সামনে ভেসে উঠল নয়নাভিরাম মুক্ত প্রকৃতির সৌন্দর্যের লীলানিকেতন।

তাপস বলল, এই অবসরে লাল শঙ্খের কিংবদন্তীর কাহিনী বলে ফেল সুজিত! কিংবদন্তীর মাঝে কি কোন গোপন তথ্য লুকোন আছে ? যা হয়ত শঙ্খ-রহস্যে নতুন আলোর সন্ধান দিতে পারে।

শঙ্খের ইতিহাস বলতে লাগল সুজিত—কিংবদন্তীর কাহিনী গড়ে উঠেছে আমার প্রপিতামহ বসন্ত রায়কে নিয়ে। অতি সাধারণ অবস্থা থেকে জীবন সুরু করেন বসন্ত রায়। নিজের চেষ্টায় তিনি প্রচুর ধন-সম্পত্তি উপার্জন করেন। জঙ্গল-কুঠির জমিদারি তাঁরই সৃষ্টি। কিন্তু সৎ উপায়ে তিনি পর্যাপ্ত ধন-সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। প্রথম যৌবনে অল্প মূলধন নিয়ে তিনি আর তাঁর বন্ধু মতিলাল চালানি কারবার আরম্ভ করেন। ধীরে ধীরে কারবার বড় হতে থাকে আর লাভের টাকার অঙ্কও বাড়তে থাকে সেই অনুপাতে।

বর্তমান জঙ্গল-কুঠির আশপাশের অঞ্চল তখন জঙ্গলে ভরা ছিল। ঐ অঞ্চলটা দুই বন্ধুতে মিলে ইজারা নেন। তারপর জঙ্গল কাটিয়ে প্রজা বিলি করে জমিদারির পত্তন করেন।

দুই বন্ধুতে চালানি কারবার করলেও সে সময়ে ওঁদের নামে একটা প্রবল গুজব ছড়িয়ে পড়ে। ওঁরা নাকি বিরাট এক ডাকাত দলের সর্দার ছিলেন—দলবল নিয়ে গঙ্গার বুকে ডাকাতি করতেন।

চালানি কারবারের আড়ালে আত্মগোপন করে আসলে ওঁরা করতেন ডাকাতি।

মূল্যবান হীরা-জহরত সংগ্রহ করার প্রবল সখ ছিল বসন্ত রায়ের। শ'খানেক মূল্যবান হীরা-জহরত সংগ্রহ করেছিলেন ছুই বন্ধুতে। ভগবান জানেন, কেমন করে ওঁরা জহরতগুলো সংগ্রহ করেছিলেন। আমার ধারণা সংগ্রহ করেছিলেন ডাকাতি করেই। ওঁরা ছুই বন্ধু যে ছুর্দান্ত দস্যু ছিলেন—সে বিষয়ে আমার এতটুকু সন্দেহ নেই।

যৌবনের প্রান্তসীমায় পৌঁছে ছুই বন্ধু জমিদারি নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। ছুজনেই আলাদা আলাদা বাড়ি এবং জমিদারি করেছিলেন। একটা ঝিলের একধারে ছিল বসন্ত রায়ের জঙ্গল-কুঠি আর অপর ধারে মতিলালের হলুদ-কুঠি।

ছুই বন্ধুর সংগৃহীত জহরতের ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়নি তখনও। একটা লোহার ছোট্ট সিন্দুকে ছিল জহরতগুলো। সিন্দুকটা থাকত বসন্ত রায়ের কাছে। পরে সুবিধে মত এক সময়ে ভাগ করে নেওয়া হবে—এমনি একটা অভিপ্রায় ছিল ছু'জনের।

পাকা জুয়াড়ী ছিলেন ছুই বন্ধু। প্রায় প্রতি সন্ধ্যেয় ওঁরা জুয়া খেলতেন। কোন কোন দিন ওঁদের স্থানীয় বন্ধুরাও যোগ দিতেন জুয়া খেলায়।

একদিন রাত্রে খাওয়ার পর ছুই বন্ধুতে জুয়া খেলতে বসলেন। খেলতে খেলতে ছুজনের মধ্যে জহরতের ভাগাভাগির প্রশ্ন উঠল। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর অবশেষে রত্ন-সিন্দুকটাকেই বাজি ধরা হল। খেলায় যে জিতবে জহরতগুলো তারই হবে। খেলা হচ্ছিল মতি-লালের বাড়ি—হলুদ-কুঠিতে।

মতিলালের খাস ভৃত্য নেপালের কাছে সে-রাতের ঘটনা শোনা গেছে—পরে অনুসন্ধান করতে গিয়ে।

সে রাতে বসন্ত রায় জঙ্গল-কুঠিতে ফিরে গেলেন। অল্পক্ষণ পরে ছোট্ট লোহার রত্ন-সিন্দুকটা কাঁধে করে নিয়ে বসন্ত রায়কে আবার আসতে দেখা গেল হলুদ-কুঠিতে।

গভীর রাত পর্যন্ত জুয়া খেলা চলল দুই বন্ধুর। চাকরেরা সব ঘুমিয়ে পড়েছে তখন। শেষ পর্যন্ত জুয়া খেলায় কে হারল আর কে জিতল জানা যায়নি।

তবে ভৃত্য নেপালের মুখে এটুকু শোনা গেছে যে, সে রাতে দুই বন্ধুর মধ্যে প্রচণ্ড বিবাদ বাধে।

পরদিন সকালে সবাই অবাক্ হয়ে দেখল, রত্ন-সিন্দুকসহ দুই বন্ধুতে অদৃশ্য হয়েছেন।

আর একটা জিনিস সবাই সভয়ে লক্ষ্য করল—হলুদ-কুঠির যে ঘরে বসে সে রাতে দুই বন্ধুতে জুয়া খেলেছিলেন, সে ঘরের মেঝেতে চাপ চাপ রক্তের দাগ। এমন কি কে কাকে খুন করল—সে কথা কিছুই জানা গেল না! যাকে খুন করা হয়েছে তার মৃতদেহ কোথায় গোপন করা হল, তাও জানা যায়নি তখন। শুধু জলজ্যান্ত মানুষ দুটো রাতের অন্ধকারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল যেন!

তারপর দশ বছর কেটে গেল। এতদিনেও কোন সন্ধান পাওয়া গেল না বসন্ত রায় আর মতিলালের। ততদিন লোকে প্রায় ভুলতে বসেছে তাঁদের কথা।

বসন্ত রায়ের স্ত্রী তখন জঙ্গল-কুঠিতে বাস করছিলেন। সুদীর্ঘ দশ বছর পরে হঠাৎ একদিন তিনি বসন্ত রায়ের চিঠি পেয়ে একমাত্র তিনিই প্রথম জানতে পারলেন তাঁর স্বামী জীবিত আছেন। কিন্তু কোথায় এবং কি অবস্থায় আছেন, সেকথা চিঠিতে কিছু লেখা নেই। আর একটা আশ্চর্য ব্যাপার—চিঠিতে মতিলালের কথা কিছু লেখেন নি।

আরও কয়েক মাস কেটে গেল। বসন্ত রায়ের স্ত্রী আর কোন সংবাদ পেলেন না স্বামীর কাছ থেকে।

তারপর একদিন গভীর রাত্রে গোপনে জঙ্গল-কুঠিতে ফিরে এলেন বসন্ত রায়। স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন। অনেক কথা হল তাঁদের—সে রাতে। কিন্তু কেন এভাবে আত্মগোপন করে আছেন, স্ত্রীর এ প্রশ্নের কোন জবাব দেননি বসন্ত রায়। স্ত্রীর প্রশ্নের উত্তরে শুধু জানিয়েছিলেন—গত দশ বছর যাবত নতুন এক জীবন যাপন করছেন তিনি। বর্তমানে ব্রহ্মদেশে এক প্রসিদ্ধ ভাস্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। পাথর কেটে এখন তিনি সুন্দর মূর্তি তৈরী করতে পারেন। শিল্পীর জীবন খুব ভালো লেগেছে তাঁর।

সে রাতে বসন্ত রায় তাঁর স্ত্রীর হাতে মেহগনি কাঠের একটা সুন্দর ছোট্ট বাক্স দিয়ে বলেছিলেন, কমল দেশে ফিরে এলে বাক্সটা তাকে দিও। কমল বসন্ত রায়ের একমাত্র পুত্র। সে তখন সহরের বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করে।

সেদিন বিদায় নেবার পূর্বে বসন্ত রায় বাক্সটা সম্পর্কে বার বার সাবধান করে দিয়ে যান স্ত্রীকে।—বাক্সটা খুব মূল্যবান। সাবধানে সিন্দুকে রেখো। কাউকে বোলো না যেন। কমল এলে তাকেই দিও। কমল ছাড়া আর কেউ যেন এ বাক্সের খবর না জানে।

সে রাতের পর আর বসন্ত রায়ের সংবাদ পাওয়া যায় নি। কিছুদিন পরে কমল রায় ফিরে এল জঙ্গল-কুঠিতে। মায়ের কাছে সমস্ত ঘটনা শুনে, মেহগনি কাঠের ছোট্ট বাক্সটা খুলে দেখল—কি আছে বাক্সে।

বাক্সের মধ্যে ছিল লাল শঙ্খ আর খামে আঁটা একটা চিঠি।

৩

বোটের গতি ফিরিয়ে বোটটাকে একটা খালের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল সুজিত।

খালের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল বোটটা। দু'পাশে খাড়া পাড়। পাড়ের ধারে ধারে গাছ-গাছালির নিবিড়তা। মাথার উপর ঘন পাতার ছাউনি।

খালটা গিয়ে মিশেছে হলুদ-কুঠি আর জঙ্গল-কুঠির মাঝখানের ঝিলটাতে।

প্রায় আধঘণ্টা পরে বোট ঝিলে প্রবেশ করল। লম্বায় চওড়ায় ঝিলটা প্রকাণ্ড। ঝিলের মাঝামাঝি জায়গায় দ্বীপের মত ছোট একটুক্রো জমি জলের মাঝে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। দ্বীপের উপর উঁচু চত্বরে জলটুঙ্গির ছাঁদে গড়া একখানা মাত্র পাকা গোলাকৃতি ঘর।

ঝিলের ডান ধারে জঙ্গল-কুঠি আর বাঁ ধারে হলুদ-কুঠি।

জঙ্গল-কুঠি আর হলুদ-কুঠির গঠন একই ধরণের—একই রকমের বিশাল বিশাল থামওয়ালা সেকেলে ধরণের উঁচু চত্বরের বিরাট দোতলা বাড়ি।

বোট থামল জঙ্গল-কুঠির ঘাটে। সুজিতের ভৃত্য বংশী অপেক্ষা করছিল সেখানে।

বংশীকে জিনিসপত্র কুঠিতে নিয়ে যাবার আদেশ দিয়ে সুজিত, তাপস আর মলয়কে সঙ্গে নিয়ে কুঠি বাড়ির দিকে এগিয়ে চলল।

দোতলার হল ঘরের নরম কৌচের উপর তাপস আর মলয়কে বসিয়ে চায়ের বন্দোবস্ত করতে গেল সুজিত।

ঘরটা এক নজর দেখে নিল তাপস। বেশ প্রকাণ্ড হল ঘর। দেওয়ালের উপর পঙ্কের কাজ করা। ঘরটা সেকেলে কিন্তু আসবাবপত্র আধুনিক।

অনেকক্ষণ পরে সুজিত একজন ভৃত্যকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল। ভৃত্যের হাতে চায়ের ট্রে। সুজিত নিজেই চা পরিবেশন করল।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে তাপস বলল, জায়গাটা বড় চমৎকার।

ময়ল বলল, শুধু চমৎকার নয়—অপূর্ব!

সুজিত হাসল। বলল, কিন্তু বড় একঘেয়ে।

এক সঙ্গে হেসে উঠল তিনজনেই।

বংশী ঘরে ঢুকল। বলল, বাবু. আপনার নামে একটা পার্সেল এসেছে। এইমাত্র পিয়ন নিয়ে এল। কাগজটা সই করে দিন, পিয়ন দাঁড়িয়ে আছে।

প্যাকিং কাগজে মোড়া ছোট একটা চৌকো বাক্স টেবিলের উপর নামিয়ে রাখল বংশী।

প্যাকেটটার দিকে তাকিয়ে সুজিত বিস্মিত হয়ে বলল, রেজিস্-টার্ড্ প্যার্সেলে কে আবার কি পাঠাল আমাকে!

তাপস বলল, পার্সেলটা যখন তোর নামে এসেছে—তখন নিতে আপত্তি কি?

সুজিত বলল, আপত্তি কিছু নেই, তবে যিনি প্যাকেটটা পাঠিয়েছেন তাঁর নামটা আমার পরিচিত বলে মনে হচ্ছে না।

সুজিত রসিদ সই করে বংশীর হাতে দিল। বংশী চলে গেল নীচে।

প্যাকেটটা তুলে নিয়ে তাপস পরীক্ষা করতে লাগল।

রেজিস্‌টার্ড পার্সেল করা হয়েছে ক্যানিং পোষ্ট অফিস থেকে। প্রেরকের নাম চিন্তাহরণ পাত্র। ঠিকানা—ক্যানিং।

একটা ছুরির সাহায্যে তাপস প্যাকেটের ওপরের মোটা কাগজটা খুলে ফেলল। খোলা কাগজের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ল একটা মেহগনি কাঠের ছোট বাক্স।

বাক্সটার উপর ঝুঁকে পড়ল সুজিত। বিস্মিত হয়ে বলল, এটাই সেই বাক্স যেটা সেদিন সন্ধ্যের পর আমার লাইব্রেরী-ঘর থেকে রহস্যময়ভাবে চুরি যায়।

অদ্ভুত তো! চোর চুরি করা জিনিস আবার ফেরত পাঠায়! মলয় মন্তব্য করল।

তাপস বলল, বাক্সটা আগে খুলে দেখ সুজিত, কি আছে ওর মধ্যে। খালি বাক্সটা পাঠিয়ে চোর হয়ত শুধু মোলায়েম গোছের একটু ঠাট্টা করেছে।

বাক্সের ডালা খুলল সুজিত। ক্ষিপ্রহস্তে দেখে নিল ভিতরটা। তারপর বলল, বাক্সের ভেতর আগে যা ছিল সবই প্রায় ঠিক আছে, নেই শুধু লাল শঙ্খ। তবে অতিরিক্ত একটা চিঠি রয়েছে দেখছি।

তাপস জিজ্ঞাসা করল, লাল শঙ্খ ছাড়া আর সবই ঠিক আছে বলছিস্?

হ্যাঁ।

কমল রায়কে লেখা বসন্ত রায়ের চিঠিটা আছে নিশ্চয়ই?

হ্যাঁ, বসন্ত রায়ের চিঠিটাও চোর ফেরত পাঠিয়েছে।

অতিরিক্ত একটা নতুন চিঠিও রয়েছে বল্‌ছিস্—কই, দেখি সেটা? তাপস সুজিতের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

সুজিত বাক্সের ভিতর থেকে খামে আঁটা চিঠিটা বের করে তাপসের হাতে দিল।

তাপস খামটা পরীক্ষা করে দেখল, তারপর সেটা ছিঁড়ে ভিতরের চিঠিটা বের করে চোখের সামনে তুলে ধরল।

চিঠির কাগজে রেইন-ডিয়ারের জলছাপ রয়েছে। সুইডেনের তৈরী অত্যন্ত মূল্যবান্ প্যাডের কাগজ এটা। সচরাচর পয়সা দিয়েও পাওয়া যায় না। কাজেই যিনি এ চিঠি লিখেছেন তিনি সৌখীন লোক—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। হাতের লেখা গোপন করবার জন্য ভদ্রলোক ইংরেজীতে টাইপ করে লিখেছেন চিঠিটা। চিঠির হুবহু বাংলা অনুবাদ করলে এই রকম দাঁড়ায়—

প্রিয় সুজিত,

সেদিন সন্ধ্যায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও কতকগুলো অপ্রয়োজনীয় জিনিস ভুল করে তোমার লাইব্রেরী-ঘর থেকে নিয়ে এসেছিলাম—সেগুলো ডাকে ফেরত পাঠালাম। বসন্ত রায়ের প্রাচীন চিঠিটাও সঙ্গে পাঠালাম। শুধু লাল শঙ্খটা রেখে দিলাম আমার কাছে। তোমার এই সামান্য ক্ষতির জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত। তবে তোমার চিন্তার কোন কারণ নেই। আশা করছি, কিছুদিনের মধ্যে লাল শঙ্খটাও তোমাকে ডাকে ফেরত পাঠাতে পারব। ইতিমধ্যে আমাকে বিশ্বাস করা ছাড়া তোমার আর কোন উপায় নেই। আশা করি আমার প্রতি তুমি বিশ্বাস রাখবে। ইতি—

তোমার চিরশুভার্থী
'চিন্তাহরণ'

তাপস চিঠি পড়া শেষ করে সুজিতের দিকে তাকাল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, চিন্তাহরণ কে? চেন নাকি ভদ্রলোককে!

সুজিত উত্তর দিল, ভগবান জানেন—কে তিনি! ও নামের কাউকে আমি কোন দিন চিনি নে। আমার মনে হয়, ভদ্রলোক নিশ্চয়ই ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন।

সম্ভবত তাই তাপস বলল, ভদ্রলোক সাধারণ ছিঁচকে চোর নন—অন্তত এটুকু ধরে নেওয়া চলে। বাক্সটা চুরি করেছিলেন একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে, এবং সে উদ্দেশ্য তাঁর সফল হয়েছে। লাল শঙ্খের ওপর যে ভদ্রলোকের লোভ, এটুকু তো বোঝাই যাচ্ছে; আর, এটুকুও অনুমান করা চলে, ভদ্রলোক লাল শঙ্খের কিংবদন্তীর কাহিনী জানেন আর বিশ্বাস করেন যে, শঙ্খটাই গুপ্তধন রহস্যের চাবিকাঠি। সুতরাং একমাত্র সারবস্তুটি রেখে অসার বস্তুগুলো পার্সেল করে ফেরত পাঠিয়েছেন।

স্বাভাবিক—খুব স্বাভাবিক কাজই করেছেন ভদ্রলোক। কিন্তু কাজে একটু ভুল করে ফেললেন ভদ্রলোক। অসার বস্তুগুলো স্বচ্ছন্দে নষ্ট করে ফেলতে পারতেন কিন্তু তা তিনি করেন নি। আর এইখানে করলেন প্রথম ভুল, ভদ্রলোক চতুর, কিন্তু তিনি দাম্ভিক। ক্রিমিনোলজিষ্ট তাপস চৌধুরীর কাছে অনেকখানি আত্ম-প্রকাশ করে ফেললেন তিনি। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন তাঁর মনের দুর্বলতা।

লাল শঙ্খের কিংবদন্তীর কাহিনী জানতেন তোদের পরিবার এবং পরিবারভুক্ত ঘনিষ্ট পরিচিত মাত্র কয়েকজন লোক। কাজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে বাইরের কোন লোকের কাছে লাল শঙ্খের কোন মূল্য নেই। আবার এটুকু অনুমান করা চলে, চোর ভদ্রলোক তোদের অত্যন্ত পরিচিত অথবা তোদের পরিবারভুক্ত কোন লোক।

আবার এমনও হতে পারে, চোর ভদ্রলোক মতিলালেরই কোন বংশধর। যা হোক, এখন ও সব চিন্তা থাক। বসন্ত রায়ের চিঠিটা একবার দে।

সুজিত মেহগনি কাঠের ছোট বাক্সের ভিতর থেকে বসন্ত রায়ের চিঠিটা বের করে তাপসের হাতে দিল।

অতি পুরাতন জীর্ণ চিঠির ভাঁজ অতি সাবধানে খুলে টেবিলের

উপর রাখল তাপস। তারপর চিঠির ময়লা-ধরা অস্পষ্ট লেখাগুলো জোরে জোরে পড়তে লাগল—

পরম কল্যাণবরেষু,

বাবা কমল,

আমার জীবনের শেষ এবং শ্রেষ্ঠ মূল্যবান সঞ্চয় এই লাল শঙ্খ তোমাকে দিয়ে গেলাম। আমাকে বিশ্বাস করিও। লাল শঙ্খ তোমাকে লক্ষ লক্ষ টাকার রত্নের সন্ধান দিবেক। লাল শঙ্খটিকে অতীব গোপনে একান্ত আপনার করিয়া রাখিও এবং শঙ্খের কারুকার্যের অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করিও। কিন্তু কাহাকেও দেখাইও না। মতিলাল আমার সহোদর ভ্রাতার অধিক। মতিলালের আত্মার সৎকার করিও, তাহার অস্থি গঙ্গায় দিও। মতিলাল আমার সম্পত্তি অপহরণ করিয়াছিল, ভগবান তাহার শাস্তি দিয়াছেন। ইতি—

নিত্য আশীর্বাদক

শ্রীবসন্ত রায়

৪

চিঠি পড়া শেষ হলে তাপস সযত্নে চিঠিটা ভাঁজ করে টেবিলের উপর রাখল, তারপর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল সুজিতের দিকে।

কি করতে হবে আর কি করতে হবে না, অত্যন্ত সহজ ভাষায় নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন বসন্ত রায় তাঁর এই চিঠিতে। বসন্ত রায়ের চিঠির নির্দেশ কিভাবে পালিত হয়েছে, তাপস জানতে চাইল।

সুজিত বলল, বসন্ত রায়ের চিঠির নির্দেশ আজ পর্যন্ত পালিত হয় নি, তাপস! বসন্ত রায়ের ছেলে,. মানে আমার ঠাকুরদা কমল রায়, এই ব্যাপার নিয়ে একটুও মাথা ঘামান নি। ব্যাপারটা তিনি সম্পূর্ণ চেপেই গেছেন। চিঠিতে স্পষ্ট স্বীকৃতি রয়েছে—বসন্ত রায় বন্ধু মতিলালকে হত্যা করেছেন। এ কথাও স্পষ্ট করে লেখা আছে—বসন্ত রায় বন্ধু মতিলালের মৃতদেহ কোন গোপন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছেন। এই গোপন হত্যার কলঙ্ক পাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে, এই ভয়ে কমল রায় এ ব্যাপার নিয়ে নাড়াচাড়া করতে সাহস করেন নি, মনে হয়। তা ছাড়া চিঠিতে বসন্ত রায়ের নির্দেশটা যতটা সোজা মনে হচ্ছে—আসলে কিন্তু অত সোজা নয়। চিঠিতে পরিষ্কার লেখা আছে—'মতিলাল আমার সহোদর ভ্রাতার অধিক। মতিলালের আত্মার সৎকার করিও, তাহার অস্থি গঙ্গায় দিও।' কিন্তু মতিলালের মৃতদেহ কোথায় লুকোনো আছে, সে কথা কিছু লেখা নেই। মতিলালের অস্থি গঙ্গায় দেবার নির্দেশ আছে, কিন্তু কোন্ জায়গায় মৃতদেহের অস্থি লুকোনো আছে তার কোন নির্দেশ নেই চিঠিটাতে!

তাপস বলল, তোর কথাগুলো পুরোপুরি মেনে নিতে পারছি না, সুজিত ! চিঠিতে গুপ্তধন আর মতিলালের মৃতদেহ-লুকোনো-গোপন জায়গার নির্দিষ্ট উল্লেখ নেই বটে, কিন্তু চিঠিটাতে সেই গোপন জায়গার ইঙ্গিত আছে। 'আমাকে বিশ্বাস করিও। লাল শঙ্খ তোমাকে লক্ষ লক্ষ টাকার রত্নের সন্ধান দিবেক। লাল শঙ্খটি অতীব গোপনে, একান্ত আপনার করিয়া রাখিও এবং শঙ্খের কারুকার্যের অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করিও। কিন্তু কাহাকেও দেখা ইও না।' এর থেকে বোঝা যায়—শঙ্খের কারুকার্যের গোপন অর্থের মাঝে লুকিয়ে আছে লক্ষ লক্ষ টাকার রত্ন-রাজি আর মতিলালের মৃতদেহ-লুকোনো-গোপন জায়গার সঙ্কেত। লাল শঙ্খের কারুকার্যের গোপন অর্থ বুঝতে পারলেই সব কিছু হাতের মুঠোয় এসে যাবে। আর একটা সম্ভাবনা চিঠির কথাগুলোর মধ্যে নিহিত আছে—বসন্ত রায়ের সংগৃহীত রত্নগুলো এবং মতিলালের মৃতদেহ একই জায়গায় রয়েছে।

কয়েক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে তাপস আবার বলতে লাগল, চিঠির কথা-গুলোর আরও একটা অর্থ করা যেতে পারে। শেষের কথাগুলো পড়লে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, বসন্ত রায় বন্ধু মতিলালের মৃতদেহ কোথায় লুকিয়েছেন, তা যেন তাঁর ছেলে কমল রায় জানতেন। তবে আর একটা জিনিস এখনও পরিষ্কার হচ্ছে না।

সেটা হচ্ছে, দুই বন্ধুর মধ্যে কে জিতেছিলেন তার ইঙ্গিত কিন্তু চিঠিতে নেই ! চিঠিতে অবশ্য রয়েছে, 'মতিলাল আমার সম্পত্তি অপহরণ করিয়াছিল, ভগবান তাহার শাস্তি দিয়াছেন।' চিঠির এই কথাগুলোর মাঝে আমার প্রশ্নের উত্তর পাবার ক্ষীণতম সম্ভাবনা আছে বটে, কিন্তু সে সম্ভাবনাটুকু বড়ই জটিল।

মূল্যবান হীরা-জহরত সংগ্রহ করার প্রবল সখ ছিল বসন্ত রায়ের। বসন্ত রায়ের চেষ্টায় এবং মতিলালের সহযোগিতায় শ'খানেক হীরা

জহরত সংগ্রহ করা হয়েছিল ডাকাতি করে। সংগৃহীত হীরা-জহরত-গুলো শেষ পর্যন্ত ছিল বসন্ত রায়ের কাছে।

দুই বন্ধু মিলিত চেষ্টায় প্রচুর ধন-সম্পত্তি উপার্জন করেছিলেন। সেই বিশাল ধন-সম্পত্তি এবং জমিদারী যৌবনের প্রান্তসীমায় এসে দুই বন্ধুতে ভাগাভাগি করে নেন। কিন্তু জহরতের ভাগ-বাঁটোয়ারা তখনও হয় নি।

জুয়া খেলতে বসে সে রাতে রত্ন-সিন্দুকের ভাগ-বাঁটোয়ারার প্রশ্ন উঠল। অবশেষে খেলায় বাজি ধরা হল রত্নগুলোকে।

চিঠির ইঙ্গিতকে যদি সত্যি বলে ধরে নেওয়া যায়, তাহলে ঘটনাটা দাঁড়ায় এই রকম : সে রাতে জুয়া খেলায় জিতেছিলেন বসন্ত রায়। খেলায় বাজি হিসেবে বিজেতা বসন্ত রায় সব ক'টি হীরা-জহরতের মালিক হলেন।

কিন্তু পরাজিত মতিলাল এটাকে মেনে নিতে পারলেন না। ফলে দুই বন্ধুতে প্রচণ্ড বিবাদ বাধল।

মতিলাল জোর করে রত্ন-সিন্দুকটি ছিনিয়ে নিতে চাইলেন বসন্ত রায়ের কাছ থেকে। বাধা দিলেন বসন্ত রায়। কিন্তু মতিলাল বাধা মানলেন না। অবশেষে মতিলালকে খুন করলেন বসন্ত রায়। সেই রত্ন-সিন্দুক আর মতিলালের মৃতদেহ কোন গোপন জায়গায় লুকিয়ে রেখে বসন্ত রায় অদৃশ্য হলেন।

এখন সেই গোপন জায়গা খুঁজে বের করতে হলে দরকার লাল শঙ্খটা। লাল শঙ্খের ওপরের কারুকার্যের গোপন অর্থ বলে দেবে—বসন্ত রায় কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন তাঁর বন্ধুর মৃতদেহ আর লক্ষ লক্ষ টাকার রত্ন-সিন্দুকটি।

সুজিত বলল, আমারও তাই মনে হয়, তাপস!

খুবই সত্যি কথা। মলয় বলল। কিন্তু বর্তমানে সারবস্তু লাল

শঙ্খটি আমাদের অধিকারে নেই। সেটি এখন চিন্তাহরণবাবুর অধিকারে আছে এবং তিনি হয়ত এতক্ষণে রত্ন-সিন্দুকের অন্বেষণে মেতে উঠেছেন।

তাপস বলল, ওই চিন্তাহরণবাবুটিকে আমাদের যে কোন উপায়ে খুঁজে বের করতে হবে, মলয়!

কিন্তু কি উপায়ে?

তোর এ প্রশ্নের জবাব ঠিক এ মুহূর্তে আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়, মলয়! তাপস সুজিতের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কমল রায় এ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামান নি, কিন্তু তোর বাবা কি ব্যাপারটা নিয়ে নাড়াচাড়া করেছিলেন?

বাবা অনেক চেষ্টা করেছেন কিন্তু তিনি লাল শঙ্খের কারুকার্যের অর্থ বুঝতে পারেন নি। বাবার প্রসঙ্গ যখন উঠল, তখন একটা কথা এখানে বলে রাখা উচিত, মনে করছি। মতিলালের নাতি বিজয়লাল আর আমার বাবা উভয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।

তোর বাবা বন্ধু বিজয়লালকে লাল শঙ্খ সম্বন্ধে কিছু বলেছিলেন কিনা, জানিস?

সেটা ঠিক বলতে পারব না, তবে বাবা আর বিজয় কাকাকে প্রায়ই গভীরভাবে আলোচনা করতে দেখা যেত।

বিজয়লাল এখনও বেঁচে আছেন?

না। বাবা মারা যাবার এক বছর আগে মারা যান বিজয় কাকা। তা প্রায় সাত বছর হল মারা গেছেন তিনি।

বিজয়লালের ছেলে আছে?

বিজয় কাকার ছেলে হয় নি। কমলাদি বিজয় কাকার একমাত্র মেয়ে। কমলাদিও গত বছর মারা গেছেন। কমলাদির একমাত্র ছেলে অরুণকুমার বর্তমানে হলুদ-কুঠির মালিক।

অরুণকুমার কি এখন হলুদ-কুঠিতে বাস করছেন ?

রসায়ন বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করছে অরুণ। কি একটা বিষয়ে হাতে-কলমে শিক্ষা নিতে গিয়েছিল জাপানে। সম্প্রতি জাপান থেকে ফিরে এসে হলুদ-কুঠিতেই আছে।

লাল শঙ্খের কিংবদন্তীর কাহিনী আর কেউ জানতো বা জানে, এমন কাউকে তুই চিনিস ?

সুজিত বলল, লাল শঙ্খের ইতিহাস জানতেন আমার মা আর আমার মামা উদয়বাবু। উদয়বাবু বর্তমানে অতি বৃদ্ধ। ঘরের বাইরে বেরোনো তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় এখন। তা ছাড়া তিনি এখন রেঙ্গুনে তাঁর ছেলের কাছে থাকেন। আর আমার মা তো বহু আগেই স্বর্গে গেছেন। আমাদের ম্যানেজার রমেনবাবুও বোধ হয় জানেন শঙ্খের ইতিহাস। তবে রমেনবাবু অত্যন্ত বিশ্বস্ত লোক। মতি-লালের ভৃত্য নেপাল বোধ হয় সমস্ত ঘটনা জানতো। নেপালের বংশধর মধু এখনও হলুদ-কুঠির প্রধান ভৃত্য। সে হয়ত জানতে পারে শঙ্খের ইতিহাস। অরুণও জানে, মনে হয়। আমি যাদের কথা বললুম, এরা ছাড়া শঙ্খের ইতিহাস আর কেউ জানে বলে আমার জানা নেই।

কিছুক্ষণ কি যেন চিন্তা করে নিল তাপস। তারপর বলল, চল্ তোর লাইব্রেরী ঘরটা একবার দেখে আসি!

সুজিত বলল, কিন্তু তার আগে আহার পর্ব শেষ করে নিলে ভাল হয়।

মলয় বলল, উত্তম প্রস্তাব। বেলা দুটো বেজে গেছে—খিদেটাও বেশ চন্‌চনে হয়ে উঠেছে।

তাপস বলল, বেশ চল, খেয়েই নেওয়া যাক আগে।

৫

সুজিতের লাইব্রেরী ঘরটা সত্যিই চমৎকার।

সুন্দর করে সাজানো লাইব্রেরীটা। বই ভর্তি আলমারিগুলো আধুনিক ধরণের তৈরী। ইংরেজী আর বাংলা বইয়ের সংগ্রহ প্রচুর। আরাম করে বসে পড়বার মত সমস্ত উপকরণ সাজানো রয়েছে ঘরটিতে। মেঝেতে পাতা রয়েছে পুরু নরম কার্পেট। দেয়ালে টাঙানো রয়েছে বিখ্যাত চিত্রকরদের আঁকা খানকয়েক ছবি। ঘরের মাঝখানে মেহগনি কাঠের একটি টেবিল। টেবিলের চারপাশে খান-কয়েক গদীমোড়া ঝকঝকে চেয়ার। টেবিলের উপর ফুলদানিতে রয়েছে মরশুমি ফুলের ঝাড়।

বেশ সুন্দর করে সাজিয়েছিস তো লাইব্রেরীটা!—তোর সুরুচির প্রশংসা করছি, সুজিত! তাপস বলল।

কোন উত্তর দিল না সুজিত, মৃদু হাসল শুধু।

মলয়ের আহারের পরিমাণটা বোধ হয় বেশি হয়ে গিয়েছিল—সে জানলার ধারের ইজিচেয়ারটার উপরে টান-টান হয়ে শুয়ে পড়ল। বলল, অল্প সময়ের মধ্যে অতগুলো চমৎকার আহার্য বস্তু সংগ্রহ করা একমাত্র তোর পক্ষেই সম্ভব, সুজিত! আমি খাদ্য সম্পর্কে তোর সুরুচির প্রশংসা করছি। আশা করি, যে ক'দিন জঙ্গল-কুঠিতে থাকব, সে ক'দিন তোর এই খাদ্য সম্পর্কে সুনামটা বজায় রাখবি।

নিশ্চয় নিশ্চয়। সুজিত হো হো করে হেসে ফেলল।

অবাক হবার ভঙ্গী করে মলয় বলল, অমন করে হাসবার কি

আছে এতে ? তাঁপস তোর মনের খোরাক সংগ্রহ করবার প্রশংসা করল, আর আমি করলাম পেটের খোরাকের।

মলয় আর সুজিতের দিকে নজর দেবার অবসর ছিল না তাপসের। সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ঘরটা দেখছিল। বেশ বড় ঘর। দক্ষিণ দিকের দরজা পেরোলেই পড়বে চওড়া বারান্দা। বারান্দা থেকে ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গেছে জঙ্গল-কুঠির পেছনের বাগানে।

চওড়া বারান্দায় এসে দাঁড়াল তাপস। আশপাশটা একবার ভাল করে দেখে নিল। বিশাল বাগান। নানান জাতের ফল আর ফুলের বিচিত্র সমারোহ। বাগানের মাঝামাঝি পড়ে বিশাল ঝিল, সেই ঝিলের মাঝে ছোট্ট জলটুঙ্গি। ঝিলের ওপারে মতিলালের প্রাসাদ—হলুদ-কুঠি।

কি মনে করে তাপস আবার ফিরে এল লাইব্রেরী ঘরে।

মলয় তখনও ইজিচেয়ারে শুয়ে, আর সুজিত একটা বই নিয়ে নাড়াচাড়া করছে।

মলয়ের ঘুমন্ত চোখের দিকে তাকিয়ে তাপস বলল, নিদ্রার আরামটুকু ত্যাগ করতে হবে, মলয় !

নিদ্রালস চোখ দুটো মেলে তাকাল মলয়। বলল, কাজের সময় আমি নিদ্রা যাওয়াটা পচ্ছন্দ করি না। বল, কি কাজ করতে হবে।

তোর সুখনিদ্রায় ব্যাঘাত দিলুম বলে দুঃখিত, মলয় ! তাপস বলল, আমাদের যন্ত্রপাতিগুলো ল্যাবরেটারীতে গুছিয়ে রাখ, আর—

আর আর কাজের ফিরিস্তিগুলো একসঙ্গে বলে ফেল, তাপস।

তাপস বলল, যন্ত্রগুলো গুছিয়ে চিন্তাহরণবাবুর চিঠিটা পরীক্ষা করবি। আমার ধারণা—চিঠিটা পরীক্ষা করলে তিনজোড়া আঙুলের ছাপের সন্ধান পাবি। যদি তিনটে বিভিন্ন ধরণের আঙুলের ছাপ পাস, তারপরে যা করতে হবে, সে তো তুই জানিস।

তার পরের কাজটা অত্যন্ত সহজ, তাপস ! তারপর সুজিতের আঙুলের ছাপ নিয়ে, ছাপের কয়েকটা ফটো-প্রিন্ট নেব। তারপরে তোর আর সুজিতের আঙুলের ছাপ মিলিয়ে বাদ দিলে পাওয়া যাবে তৃতীয় ব্যক্তি চিন্তাহরণবাবুর আঙুলের ছাপ।

তারপর ?

তারপর দেখতে হবে টাইপ করা চিঠির মধ্যে কোন রহস্যের সন্ধান পাওয়া যায় কিনা।

উত্তম। কাজ শুরু করে দে, মলয়। ইতিমধ্যে আমি একবার বাগানের মুক্ত বায়ু সেবন করে আসি।

তাপস বারন্দার সিঁড়ি দিয়ে বাগানে নেমে গেল।

সারা বাগানটা ঘুরে দেখতে লাগল তাপস। অবশেষে বাগানের শেষ প্রান্তে পাঁচিলের ধারে এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়াল, যেখান থেকে সুজিতের লাইব্রেরী ঘরটা স্পষ্ট দেখা যায়।

সেখানে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তাপস একটা খোলা জানলার মধ্যে দিয়ে তাকালো লাইব্রেরী ঘরের ভেতরে।

ঘরের মেহগনি কাঠের টেবিলটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আর দেখা যাচ্ছে, টেবিলের ধারে বসে সুজিত বই পড়ছে।

আশপাশের জায়গাটা পরীক্ষা করতে লাগল তাপস।

পরীক্ষা করে তাপস বুঝতে পারল, বাগানের এদিকটায় লোকের যাতায়াত কম। কাঁটা, ঘাস আর শুকনো ঝরা-পাতায় জায়গাটা ভরে রয়েছে।

পায়ের ছাপ দেখতে পাবার আশায় তাপস ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করতে লাগল। কয়েকদিন আগে বোধ হয় এদিকে বৃষ্টি হয়ে গেছে। গাছের ছাওয়ায় আশপাশের মাটি এখনও নরম আছে।

অবশেষে একটা মোটা গাছের তলায় এক জোড়া ছাপ দেখতে

পেল সে। এক জোড়া জুতোর ছাপ গভীরভাবে মাটির বুকে আঁকা রয়েছে। চট করে নজরে পড়ে এমন স্পষ্ট ছাপ। জুতোর সোলের খাঁজ-কাটা অংশগুলো অস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। তাপস পকেট থেকে লেন্স বের করে উবু হয়ে বসে লেন্সের সাহায্যে জুতোর ছাপ পরীক্ষা করতে লাগল।

উবু হয়ে বসে ছাপ পরীক্ষা করতে গিয়ে তাপস ঘাসের মধ্যে থেকে দশ-বারোটা পোড়া সিগারেটের টুকরো আবিষ্কার করল। সিগারেটের কয়েকটা টুকরো একটা কাগজে মুড়ে পকেটে রাখল, তারপর পকেট থেকে একটা স্প্রিং-টেপ বের করে জুতোর ছাপের মাপ নিল।

তাপস মনে মনে ভাবল, জুতোর ছাপের মালিক যদি শঙ্খ-চোর হয়, তাহলে তিনি এখানে প্রায় ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করেছেন এবং একটার পর একটা সিগারেট ধরিয়েছেন।

পিছনে পায়ের শব্দ শোনা গেল। চিন্তিত মুখে পিছু ফিরতে তাপস দেখল, সুজিত আসছে এদিকে। সুজিতকে আসতে দেখে বলল, এদিকে আয়, সুজিত। এসে ভালই করেছিস। এখুনি তোকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

অবাক হয়ে সুজিত জিজ্ঞাসা করল, হঠাৎ তোর কি কথা জানবার প্রয়োজন হয়ে পড়ল ?

তাপস বলল, গাছের গোড়ার দিকে তাকিয়ে দেখ, সুজিত—স্পষ্ট এক জোড়া জুতোর ছাপ পড়েছে।

ছাপ লক্ষ্য করে সুজিত বলল, হ্যাঁ, তাই তো দেখছি—নরম মাটির ওপর স্পষ্ট জুতোর ছাপ রয়েছে। কিন্তু কি আশ্চর্য—এখানে জুতোর ছাপ পড়ল কি করে ?

কেন, এতে আশ্চর্য হবার কি আছে ?

আশ্চর্য হবার মত যথেষ্ট যুক্তি আছে, তাপস!—কারণ বর্তমানে আমি এবং তোরা দু'জন ছাড়া জঙ্গল-কুঠিতে আর এমন কেউ নেই যে বাগানে শু-জুতো পরে এসে গাছের তলায় দাঁড়াবে।

সুজিত বলল, তাছাড়া এদিকটাতে জঙ্গল বলে বড় একটা কেউ আসে না।

তাপস বলল, জুতোর মালিক ভদ্রলোক এখানে বেড়াতে এসেছিলেন বলে মনে হয় না, সুজিত! কোন একটা উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি এখানে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলেন। ভদ্রলোক চেন-স্মোকার,—অর্থাৎ একটার পর একটা ক্রমাগত সিগারেট খেতে অভ্যস্ত। মনে হয়, অপেক্ষা করতে করতে তিনি অধৈর্য হয়ে পড়েছিলেন এবং একটার পর একটা সিগারেট তৈরী করেছেন নিজের হাতে—গোটা কয়েক করে টান দিয়ে সিগারেটটা ফেলে দিয়েছেন মাটিতে। আবার নতুন সিগারেট তৈরী করে নতুন করে অগ্নি সংযোগ করেছেন। আশপাশে একটাও দেশলায়ের পোড়া কাঠি খুঁজে পাইনি, তাই থেকে অনুমান করা চলে ভদ্রলোক লাইটার ব্যবহার করেন।

জুতোর মালিক ভদ্রলোক সৌখীন এবং ধনী। জুতো জোড়া একেবারে নতুন এবং মূল্যবান। পায়ের ছাপের মাপ এবং গভীরতা দেখে অনুমান করা চলে ভদ্রলোক বেশ লম্বা এবং মোটা-সোটা, ভারিক্কি ওজনের। কিন্তু কি উদ্দেশে ভদ্রলোক এখানে এসেছিলেন? এ প্রশ্নের আনুমানিক সুষ্ঠু জবাব পাওয়া যেতে পারে—যদি ধরে নেওয়া যায়, জুতোর মালিক ভদ্রলোক শঙ্খ-চোর, কারণ এখানে দাঁড়িয়ে সোজা তাকালে নজর পড়ে লাইব্রেরী ঘরটা। লাইব্রেরী ঘরের মাঝের টেবিলটা এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

সুজিত বলল, অন্ততঃ আমার তাই মনে হয়। অবশ্য চিন্তাহরণবাবুর নিয়োজিত কোন লোকও হতে পারে। তবে এ ব্যাপারে

চিন্তাহরণবাবুর পক্ষে অন্য কোন লোক নিয়োগ করা সম্ভব নয়, আর উচিতও নয়। কারণ লাল শঙ্খের ব্যাপারটা গোপন রাখা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। আচ্ছা, এর মধ্যে ঠিক কবে এখানে বৃষ্টি হয়েছিল তোর মনে আছে ?

চারদিন আগে—মানে গত শনিবার এখানে বৃষ্টি হয়েছিল।

তাহলে হিসেব মত—শাঁখটা চুরি যাবার আগের দিন এখানে বৃষ্টি হয়েছে। সেদিনের পর আর বৃষ্টি হয় নি তো ?

না।

তাহলে ধরে নেওয়া যায়, চুরির ঘটনার দিন সন্ধ্যের পর চিন্তাহরণবাবু এখানে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তুই তখন লাইব্রেরী ঘরে টেবিলের সামনে বসে শাঁখ নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলি আর এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিন্তাহরণবাবু লক্ষ্য করছিলেন তোর কার্যকলাপ। ওদিকে চিন্তাহরণবাবুর নিয়োজিত কোন লোক ধানের গাদায় আগুন লাগিয়ে দেয়। ভৃত্যের কাছে সংবাদ পেয়ে তুই মেহগিনি কাঠের বাক্সটা সমেত শাঁখটাকে টেবিলের খোলা ড্রয়ারের মধ্যে রেখে তাড়াতাড়ি লাইব্রেরী ঘর থেকে চলে যাস। আর সেই সুযোগে চিন্তাহরণবাবু ঐ বাক্সটা নিয়ে যান।

সুজিত বলল, আমারও তাই মনে হয় তাপস! কিন্তু চিন্তাহরণ বাবুটি যে কে, সেটাই এখনও বোঝা গেল না!

তাপস বলল, চিন্তাহরণবাবু কে—সেটা সঠিক অনুমান করা এখন আমার পক্ষেও সম্ভব নয়, সুজিত। তবে তাঁর সম্বন্ধে বর্তমানে আমরা এটুকু জানতে পেরেছি—চিন্তাহরণবাবু দাম্ভিক প্রকৃতির, সৌখীন, চেন-স্মোকার, এবং লোকটা বেশ ভারিক্কি। আর একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে—শুধু ওই শাঁখটাকেই হস্তগত করা ভদ্রলোকের উদ্দেশ্য। আর ভদ্রলোক তোদের পরিচিত মহলের

কেউ একজন। এখন ভদ্রলোক কি টোবাকো, মানে সিগারেট-তামাক ব্যবহার করেন, সেটা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। তোর কাছে দেশলাই আছে ?

সুজিত পকেট থেকে দেশলাই বের করে দিল।

তাপস কুড়োনো সিগারেটের টুকরোগুলো ছিঁড়ে বেশ খানিকটা টোবাকো সংগ্রহ করল। তারপর সংগৃহীত টোবাকো বাঁ হাতের তালুতে রেখে ডান হাত দিয়ে ক্ষুদ্র গোল বল তৈরী করল। বলটা মাটিতে একটা কাগজের উপর রেখে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে আগুন ধরিয়ে দিল।

পরমুহূর্তে সুন্দর মিষ্টি সুগন্ধের ধোঁয়ায় জায়গাটা ভরে উঠল। তাপসের মুখ দিয়ে শুধু বেরিয়ে এল একটি কথা—ডব্লিউ. জে. আর।

৬

বাগান থেকে ফিরে এসে তাপস প্রবেশ করল সুজিতের ল্যাবরেটারী ঘরে। মলয় সেখানে তখন ব্যস্ত ছিল একটা ফটো-প্রিণ্ট নিয়ে। কর্মব্যস্ত মলয় তাপসকে দেখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

তাপস জিজ্ঞাসা করল, পরীক্ষার ফল নিশ্চয় শুভ, মলয় ?

মলয়ের চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল সফলতার হাসি। বলল, সন্তোষজনক বলেই মনে হচ্ছে।

উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করল তাপস, চিন্তাহরণবাবুর আঙুলের ছাপ পেয়েছিস ?

আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে—কিন্তু খুবই অস্পষ্ট। তবে খামের ওপর আরও স্পষ্ট ছাপ পাওয়া গেছে। তারই প্রিণ্ট নিচ্ছি।—দেখা যাক, কি ফল পাওয়া যায়। একটু অপেক্ষা কর, হাতের কাজটা সেরে নিই।

খোলা জানলার সামনে গিয়ে বসল তাপস।

অল্পক্ষণ পরে সুজিত ঘরে এল, হাতে একটা কাগজের মোড়ক। তাপস জিজ্ঞাসা করল, কাগজে মুড়ে কি নিয়ে এলি, সুজিত ?

চিন্তাহরণবাবুর ফেলে যাওয়া রুমাল।

তাপস বলল, ভালই করেছিস। রুমালটা থেকে চিন্তাহরণবাবুর সম্পর্কে কিছু জানা যায় কিনা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

সামনের টেবিলটার উপরে কাগজের মোড়কটা রাখল সুজিত।

তাপস বলল, বড় লেন্স আর মাইক্রোস্‌কোপটা নিয়ে আয়।

সুজিত মাইক্রোস্‌কোপ আর লেন্সটা এনে দিল তাপসের টেবিলে। তাপস ততক্ষণে রুমালটা বের করে টেবিলের উপর সাবধানে মেলে দিয়েছে।

তাপসের মুখোমুখি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল সুজিত, আর তাপস লেন্সের সাহায্যে অত্যন্ত সতর্কভাবে রুমালটা পরীক্ষা করতে লাগল।

প্রায় পনের মিনিট পরে তাপস রুমাল থেকে চোখ তুলে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল। তারপর মলয়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, তোর কাজ শেষ হয়েছে মলয় ?

হ্যাঁ, হয়েছে।

মলয় ভিজে প্রিন্টিং পেপার শুকোতে দিয়ে তাপসের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল। তাপস ওকে যন্ত্রের ছোট ব্যাগটা নিয়ে আসতে বলল।

মলয় ব্যাগ এগিয়ে দিল তাপসের টেবিলে।

তাপস আবার ঝুঁকে পড়ল রুমালের উপরে। কিছুক্ষণ ধরে পরীক্ষা করবার পর বলল, আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন, সুজিত ! রুমালটা চিন্তাহরণবাবুকে আবিষ্কার করতে যথেষ্ট সাহায্য করবে।

সুজিতের উত্তরের অপেক্ষা না করে তাপস একটা সরু চিমটে নিয়ে আবার ঝুঁকে পড়ল রুমালের দিকে। তারপর চিমটের সাহায্যে অতি সূক্ষ্ম দুটি চুল রুমাল থেকে তুলে নিয়ে একটি সাদা কাগজের উপর রেখে সেগুলোর পরীক্ষা শেষ করে বলল, মাইক্রোস্‌কোপে একবার চোখ লাগিয়ে দেখ, মলয় !

মাইক্রোস্‌কোপের উপরে চোখ রেখে মলয় চুল দুটো দেখে বলল, চুলের রঙ লালচে। কালো রঙের কোটিং রয়েছে। চুলগুলো কোঁকড়ান এবং অত্যন্ত ফিনফিনে। চুলের গঠনভঙ্গি দেখে মনে হয়, চুলের

মালিক ভদ্রলোক মাথার চুল ব্যাক-ব্রাশ করেন। চুলের গোড়ার বল দেখে মনে হয়—ভদ্রলোকের চুলের ক্ষয়রোগ সুরু হয়েছে সম্প্রতি। চুলের উজ্জ্বলতা কমে গেছে অনেকখানি। সম্প্রতি টাক-পড়া সুরু হয়েছে, সম্ভবতঃ কপালের ওপর—উভয় পাশে।

আর কিছু ? উৎসাহিত হয়ে তাপস জিজ্ঞাসা করল।

মলয় বলল, ভদ্রলোক প্রচুর ঘামেন ! ঘর্মাক্ত টাক রুমাল দিয়ে মোছেন যখন তখন।

আর কিছু তোর নজরে পড়েছে, মলয় ?

আর তেমন কিছু তো নজরে পড়ছে না, তাপস !

ভাল করে আর একবার পরীক্ষা কর, মলয় ! তাপস বলল।

মাইক্রোস্কোপে আর একরার চোখ লাগিয়ে চুল দুটো ভাল ভাবে পরীক্ষা করে দেখল মলয়। বেশ কিছুক্ষণ পরীক্ষা করবার পর বলল, এমন একটা জিনিস যে আমার দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে তা আমি কল্পনা করতেও পারি নি, তাপস !

তাপস কোন উত্তর দিল না, মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

মলয় বলল, এ রকম কোঁকড়া ফিনফিনে আর লালচে চুল বাংলা দেশে বড় দেখা যায় না, তাপস ! অনেকটা নিগ্রোদের মাথার চুলের মতো।

তাপস বলল, তোর অনুমান ঠিক, মলয় ! এ ধরণের চুল অবশ্য সুন্দরবন অঞ্চলের জেলেদের মধ্যে কিছু কিছু দেখা যায়। আপাততঃ আমরা চিন্তাহরণবাবু সম্পর্কে যতটুকু জানতে পেরেছি তা দিয়ে লোকটিকে খুঁজে বের করা আমাদের পক্ষে সুকঠিন হবে না।

সৃজিত বলল, তাহলে চিন্তাহরণবাবু সম্পর্কে তুই অনেক কিছু জানতে পেরেছিস তাপস, যা দিয়ে সহজেই তাঁকে আমরা গ্রেপ্তার করতে পারি ?

তাপস বলল, চিন্তাহরণবাবু সম্পর্কে যতটুকু আমি জানতে পেরেছি, তা দিয়ে বর্তমানে তাঁর দেহের এবং স্বভাবের একটা কাল্পনিক বর্ণনা দিতে পারি। অবশ্য একমাত্র তোর পক্ষেই সম্ভব আমার কল্পনার মানুষটিকে বাস্তবে টেনে আনা।

সুজিত বলল, বুঝতে পেরেছি তাপস, তুই বলতে চাস্ চিন্তাহরণবাবু যখন আমাদের পরিবারের ঘনিষ্ঠ পরিচিত একজন, তখন চিন্তাহরণবাবুর চেহারা আর স্বভাবের একটা মোটামুটি বর্ণনা পেলে আমার পক্ষে তাঁকে খুঁজে বের করা অত্যন্ত সহজ হবে। এই তো ?

তাপস হেসে বলল, ঠিক তাই।

সুজিত বলল, বেশ, তাহলে তোর কাল্পনিক চিন্তাহরণবাবুর রূপ বর্ণনা কর !

একটু ভেবে নিয়ে তাপস বলল, এক কথায় চিন্তাহরণবাবু সৌখীন এবং ধনী। তিনি বেশ লম্বা এবং মোটা-সোটা, ভারিক্কি ওজনের। আনুমানিক বয়স ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে। ভদ্রলোক চেন-স্মোকার, সিগারেট তৈরী করেন নিজের হাতে। ব্যবহার করেন মূল্যবান টোবাকো ডব্লিউ, জে, আর। ভদ্রলোকের চুলের রং লালচে। ফিনফিনে পাতলা আর কোঁকড়ানো চুল ব্যাক-ব্রাশ করা। সম্প্রতি ভদ্রলোকের মাথায় চুল উঠতে শুরু করেছে। সামনে কপালের ওপর টাক পড়তে আরম্ভ হয়েছে। ভদ্রলোক বেশ ঘামেন। ঘর্মাক্ত কপাল আর টাক রুমাল দিয়ে মোছেন যখন তখন। চিন্তাহরণবাবু লালচে চুলকে স্বাভাবিক কালো করবার জন্যে চুলে কলপ ব্যবহার করেন। এর চেয়ে বেশি কিছু বলা যাবে না এখন আর।

চিন্তাহরণবাবুর দেহের বর্ণনা শুনতে শুনতে সুজিতের মুখের হাঁ অত্যধিক বিস্ময়ে ক্রমশঃ বড় হচ্ছিল। নিজের চেয়ার থেকে উঠে টেবিলের উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ছিল সে। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে

পড়েছিল। তাপস চুপ করতেই সুজিত বলল, এটুকু বর্ণনাই যথেষ্ট, তাপস! চিন্তাহরণবাবুর আসল রূপ আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠেছে।

মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল তাপসের ঠোঁটের উপরে। জিজ্ঞাসা করল, চিনতে পেরেছিস নাকি?

হ্যাঁ। আরে, ও তো আমাদের অরুণকুমার, কমলাদির ছেলে। অরুণকুমার বর্তমানে হলুদ-কুঠির মালিক।

৭

বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটে নি সুজিতের।

কমলাদির ছেলে অরুণকুমার যে চিন্তাহরণবাবু এবং সে-ই যে শঙ্খ-চোর, কিছুক্ষণ আগেও এমন একটা ধারণা কল্পনাও করতে পারেনি সুজিত। বিস্ময়ের আকস্মিকতা ওকে হতবাক করে দিয়েছিল যেন!

অরুণের মত এমন ভাল ছেলে কিনা শেষ পর্যন্ত চুরির আশ্রয় নিল! লোভ ভালমানুষকেও কত নীচে নামায়!

তাপস কোন জবাব দিল না। সুজিত বলল, যা হয়ে গেছে তা নিয়ে চিন্তা করে কোন লাভ নেই। চল, এখনি যাওয়া যাক অরুণের কাছে।

তারপর?

ওকে বুঝিয়ে শঙ্খটা আদায় করব, চুকে যাবে সব গণ্ডগোল।

তাপস জিজ্ঞাসা করল, অত সহজে গণ্ডগোল কি মিটবে?

তাপসের কথায় সুজিত বেশ একটু গরম হয়ে উঠল। বলল, মিটবেনা মানে? চোর ধরা পড়ল অথচ চুরির জিনিস পাওয়া যাবেনা, এ-ই বা কেমন কথা?

তাপস বলল, চোর যদি চুরির জিনিস দিতে অস্বীকার করে?

এবার রীতিমত চটে উঠল সুজিত। বলল, অস্বীকার করলেই হল? দেশে আইন নেই? থানা পুলিশ নেই?

তাপস জবাব দিল, এ ক্ষেত্রে পুলিশের সাহায্য নেওয়া আমাদের পক্ষে ঠিক হবে না। আর আমরা যে পুলিশের সাহায্য নিতে পারব

না এটুকু অরুণকুমার ভাল করেই জানেন, কাজেই ওপথে শঙ্খ উদ্ধার করতে না যাওয়াই ভাল। অন্য কোন উপায় অবলম্বন করতে হবে।

উত্তেজিত সুজিত হতাশ হয়ে চেয়ারের উপর এলিয়ে পড়ল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে বসে কি যেন চিন্তা করে নিল। তারপর বলল, এ ক্ষেত্রে পুলিশের সাহায্য নেওয়া চলবে না, এ কথা আমি ভাবিনি তাপস। কিন্তু পুলিশের সাহায্য ছাড়া শঙ্খটা উদ্ধার করা যাবে কি উপায়ে?

তাপস বলল, ও সম্পর্কে আমি এখনও কিছু চিন্তা করিনি। তবে চোরের সন্ধান যখন পেয়েছি তখন চুরির জিনিস উদ্ধারের একটা উপায় করে নিতে হবে বই কি! আচ্ছা, শাঁখটার যে ফটো তুলেছিলি, সেটা কি করলি? হারিয়ে ফেলেছিস বুঝি? নেগেটিভটাও কি হারিয়েছিস?

সুজিত বলল, হারাই নি ঠিক। তবে কোথায় রেখেছি মনে পড়ছে না। থাম, খুঁজে দেখছি এখনি।

ফটোর খোঁজে গেল সুজিত। আর গভীর চিন্তায় মগ্ন হল তাপস।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে ফিরে এল সুজিত। হাতে একটা এন্‌লার্জমেণ্ট করা ফটো।

তাপসের কণ্ঠে আগ্রহের সুর ফুটে উঠল, জিজ্ঞাসা করল, ফটোটা খুঁজে পেয়েছিস দেখছি।

সুজিত ফটোটা তাপসের হাতে দিতে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে ফটোটাকে টেবিলে উপর রাখল সে চিন্তিত মনে।

সুজিত সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, বুঝলি কিছু?

গভীর চিন্তায় মগ্ন তাপস সুজিতের কথা শুনতেই পেল না বোধ হয়।

আরও কয়েক মিনিট নিঃশব্দে কাটল।

সুজিত আবার জিজ্ঞাসা করল, কি রে তাপস, কিছু বুঝলি ?

সজাগ হয়ে উঠল তাপস। বলল, ফটো দেখেই বোঝা যায় শাঁখটা বেশ সুন্দর। কারুশিল্পের একটা চমৎকার নিদর্শন। বসন্ত রায় একজন প্রকৃত শিল্পী ছিলেন। আচ্ছা সুজিত, তুই তো ভাল করেই লক্ষ্য করেছিস্ শাঁখটা ?

নিশ্চয়ই।

শাঁখের ওপর খোদাই করা চিত্রগুলোর ওপর নিশ্চয়ই কালো রং দেওয়া আছে ?

হ্যাঁ। খোদাই চিত্রগুলোর ওপরে কালো রং দেওয়া আছে।

তাপস যেন নিজেকে শুনিয়ে বলল, তাই থাকা স্বাভাবিক। লালের ওপর কালো রংটাই খোলে ভাল।

অধৈর্য হয়ে সুজিত বলল, ওসব আমার জানা আছে তাপস! ছবিটা দেখে নতুন কিছু জানতে পারলি কিনা তাই বল।

তাপস হেসে বলল, ধীরে, বন্ধু ধীরে। অত অধৈর্য হলে এ সব কাজে সফলতা লাভ করা যায় না।

তাপস আবার শঙ্খের ফটোটা টেবিল থেকে তুলে নিয়ে গভীর আগ্রহে দেখতে লাগল।

শঙ্খের উপর উৎকীর্ণ চিত্রটি আকৃতিতে চতুষ্কোণ। চারিদিকে বর্ডারে ছক কাটার মত ছোট ছোট ঘর। প্রত্যেকটি ঘরে একটি করে চিত্র খোদাই করা হয়েছে। ভিতরে মূল চতুষ্কোণ অংশটি বেশ বড়। ভিতরের অংশে উপরের দিকে দুটি বড় বাড়ির চিহ্ন আঁকা। বাড়ি দুটির গায়ে সমান্তরাল লাইনের মাঝে তীরযুক্ত বৃত্তের মধ্যে ৪ আর ২ সংখ্যা উৎকীর্ণ। দুটি লাইন গিয়ে মিশেছে নীচের অংশের গাছ-গাছালিতে ঘেরা ছোট্ট একটি ঘরে। আর এগুলির মাঝে লেখা রয়েছে হেঁয়ালিতে ভরা ছোট্ট একটি ছড়া।

উৎকীর্ণ ছড়াগুলো পড়তে লাগল তাপস ঃ

গায় হলুদের শূন্য গায়,
নীলকুঠির নীল নেইকো তায়।
জলটুঙ্গিতে সেখান হ'তে
মাটির তলার আধেক পথে,
পাথর চাপা মৃতের থান,
হেঁয়ালিতে দিই নিশান।

পড়া শেষ করে তাপস আবার চিন্তিত হয়ে পড়ল। গভীর চিন্তায় রেখাকুটিল হয়ে উঠল তাপসের প্রশস্ত কপাল।

৮

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। আলো জ্বেলে দেওয়া হয়েছে ঘরে। তাপস তখনও চোখ বুজে ইজি-চেয়ারে বসেছিল। গভীর চিন্তার সুস্পষ্ট চিহ্ন ফুটে উঠেছে ওর চোখে-মুখে।

তাপসের এই নীরবতা সুজিতকে ক্রমশঃ অধৈর্য করে তুলছিল। ধৈর্যেরও একটা সীমা থাকে। তাই চুপ করে থাকতে পারল না সুজিত আর। জিজ্ঞাসা করল, হেঁয়ালির অর্থ কিছু বুঝলি—না, যে তিমিরে সেই তিমিরেই ?

সহজ ভাবে তাপস জবাব দিল, হেঁয়ালির অর্থ এখনও কিছু বুঝতে পারি নি, তবে আশা করছি বুঝতে পারব।

হেঁয়ালির অর্থ বুঝতে পারবি, এ আশা করছিস্ তাহলে ?

নিশ্চয়ই। তাপস দৃঢ়ভাবে বলল, হেঁয়ালির বক্তব্য যে অত্যন্ত স্পষ্ট।

অবাক হয়ে তাপসের চোখের উপর চোখ রেখে সুজিত জিজ্ঞাসা করল, তাই নাকি ! সত্যিই বুঝেছিস তাহলে ?

এখনও সম্পূর্ণ বুঝতে পারি নি বটে। হেঁয়ালির ছড়ার প্রথম দু' লাইনের অর্থ রহস্যময়, অবশিষ্ট লাইন চারটে জলের মত সোজা। 'গায়ে হলুদের শূন্য গায়, নীল-কুঠির নীল নেইকো তায়।' এই নীল-কুঠির নীল যে কি বস্তু এটাই ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না। আমার মনে হয়, কমল রায় নীল-কুঠির নীলের সন্ধান জানতেন। তাই বসন্ত রায় হেঁয়ালির ছড়ার মধ্যে লিখেছেন ও কথাটা। আমি শুধু ভাবছি,

হলুদ-কুঠি আর জঙ্গল-কুঠির মাঝে নীল-কুঠি আসে কোথা থেকে? আমার এ প্রশ্নের জবাব কে দেবে? আশেপাশে কোন নীল-কুঠি ছিল বলে তোর জানা আছে, সুজিত?

না, এ এলাকায় কোন নীল-কুঠি ছিল বলে আমার জানা নেই। তবে আমাদের ম্যানেজার রমেনবাবু হয়ত জানতে পারেন। উনি এ অঞ্চলের পুরোনো লোক। ওঁরা পুরুষানুক্রমে আমাদের ষ্টেটের ম্যানেজার। ডাকব রমেনবাবুকে?

তাই ডাক, সুজিত। ওঁর সঙ্গে একটু আলাপ করা যাক্।

রমেনবাবুকে ডেকে আনবার জন্য সুজিত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে একজন সৌম্যদর্শন বৃদ্ধকে নিয়ে এসে তাপসের সঙ্গে রমেনবাবুর পরিচয় করিয়ে দিল সুজিত।

অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকাল তাপস রমেনবাবুর দিকে। শক্ত, সমর্থ, সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ। দেহের রং সুগৌর। লম্বা-চওড়া গোলগাল চেহারা। প্রশস্ত কপাল, উন্নত নাসা। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় দিচ্ছে।

চেয়ারে বসতে বসতে রমেনবাবু তাপসকে একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখে নিয়ে বললেন, তারপর তাপসবাবু, বুড়োকে স্মরণ করলেন কেন?

তাপস বলল, আপনার কাছে কিছু জানতে চাই কাকাবাবু!

সরল অমায়িক হাসিতে ভরে উঠল রমেনবাবুর ঠোঁট জোড়া। হাসতে হাসতে বললেন তিনি, সুজিতের বন্ধু তোমরা, সুজিতের মত যখন আমাকে কাকাবাবু বলে ডাকলে, তখন আমিও তোমাদের সঙ্গে আপনির সম্পর্ক রাখব না। আমার ছেলেমেয়ে নেই, সুজিতই আমার পুত্রের স্থান অধিকার করেছে। বল তাপস, কি জানতে চাও তুমি?

তাপস জিজ্ঞাসা করল, জঙ্গল-কুঠির পুরোনো ইতিহাস কিছু জানেন আপনি?

হাসিমুখেই রমেনবাবু বললেন, জঙ্গল-কুঠির পুরোনো ইতিহাসের অনেক কিছুই তো আমার জানা আছে, তাপস !

তাহ'লে লাল শঙ্খের কিংবদন্তীর কাহিনীও শুনেছেন নিশ্চয়ই ?

হ্যাঁ। বসন্ত রায়ের গুপ্তধনের কাহিনীও আমার শোনা আছে।

গুপ্তধনের কাহিনী আপনি বিশ্বাস করেন ?

ওর ওপর আমার কোন লোভ নেই, কাজেই ও সম্পর্কে আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কোন প্রশ্নই ওঠে না। সত্যি কথা বলতে কি, আমি বসন্ত রায়ের গুপ্তধন নিয়ে কোনদিন মাথা ঘামাই নি। তবে এটুকু জানি, সুজিত বছরখানেক হল ঐ তথাকথিত গুপ্তধন উদ্ধারের চেষ্টা করছে, আর এও জানি, তোমরা জঙ্গল-কুঠিতে এসেছ এই ব্যাপারে সুজিতকে সাহায্য করতে। পারিবারিক গুপ্ত খবরকে বাইরের কেউ জানুক, এ আমি চাই নে। এ ব্যাপারে সুজিতকে তোমাদের সাহায্য গ্রহণ করতে দেখে আমি মনে মনে অসন্তুষ্ট হয়েছিলাম। এবং তোমাদের এখানে পদার্পণ করার মুহূর্ত থেকে তোমাদের ওপর আমি অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টি রেখেছিলাম। তোমাদের কাজের ধারা দেখে এখন আমার মত পরিবর্তন হয়েছে এবং আমার ধারণা হয়েছে সুজিত অপাত্রে আস্থা স্থাপন করে নি। আর সত্যি কথা বলতে কি, আমার ধারণা হয়েছে—তুমি তথাকথিত গুপ্তধন উদ্ধারের ব্যাপারে একটা সুষ্ঠু মীমাংসায় আসতে পারবে মনে হচ্ছে। তোমাকে আমি সর্বতোভাবে সাহায্য করতে প্রস্তুত, তাপস ! বল, তুমি কি জানতে চাও ?

কোন সময়ে এখানে নীলের চাষ হত নাকি কাকাবাবু ? নীলকর সাহেবদের কোন কুঠি ছিল এখানে ?

কোন সময় এখানে নীল চাষ হত কিনা আমার জানা নেই, তাপস ! তবে নীলকর সাহেবদের কোন কুঠি যে এখানে ছিল না এটুকু

আমার ভালভাবেই জানা আছে। কারণ আজ পর্যন্ত কোন নীল-কুঠির ধ্বংসাবশেষ আমার চোখে পড়ে নি, এমন কি জমিদারি সংক্রান্ত কোন দলিলে নীল-কুঠি বা নীল-চাষের কথা উল্লেখ নেই।

আচ্ছা কাকাবাবু, জঙ্গল-কুঠি আর হলুদ-কুঠি তৈরি করিয়েছিলেন কে? বসন্ত রায় না মতিলাল?

বাড়ি দুটো বসন্ত রায়ের ইচ্ছা আর আদেশ মত তৈরী হয়েছিল। তুমি বোধ হয় লক্ষ্য করেছ, বাড়ি দুটোর গঠন একই রকম।

বাড়ি দুটোর নামও বোধ হয় বসন্ত রায় নিজেই দিয়েছিলেন?

হ্যাঁ। কিন্তু—

কিন্তু কি কাকাবাবু?

কিন্তু জঙ্গল-কুঠির প্রাচীন নাম অন্য ছিল। বসন্ত রায়ের ছেলে কমল রায়ের আমলে বাড়ির নাম এবং রং বদলে যায়। কমল রায় এ বাড়ির নাম রাখেন জঙ্গল-কুঠি।

বসন্ত রায় এ বাড়ির কি নাম দিয়েছিলেন, আপনার জানা আছে, কাকাবাবু?

প্রাচীন দলিলপত্রে এ বাড়ির নাম 'নীল-কুঠি' বলে উল্লিখিত আছে। আমার ধারণা বসন্ত রায় এ বাড়ির নাম দিয়েছিলেন নীলকুঠি।

এ বাড়ির নাম যে নীল-কুঠি লেখা আছে, দলিলে আপনি ঠিক দেখেছেন তো কাকাবাবু? তাপসের কণ্ঠে গভীর আগ্রহের সুর।

হ্যাঁ হ্যাঁ। এ সব ব্যাপারে আমার কখনও ভুল হয় না।

রমেনবাবু মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। তারপর বললেন, দেখ তাপস, এই বাড়ি দুটোর নাম আর কি রং দেওয়া হবে তাই নিয়ে এক মজাদার গল্প আছে। আমি আমার বাবার কাছে শুনেছিলাম সে গল্প। বসন্ত রায় ছিলেন দারুণ খামখেয়ালী। খেয়ালের অন্ত ছিল না তাঁর। জ্যোতিষশাস্ত্রে বসন্ত রায়ের প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। উনি

ঠিক করলেন বাড়ি দুটোর নাম আর রং দেওয়া হবে ওঁর নিজের এবং মতিলালের জন্মরাশির শুভ রঙের সঙ্গে সংগতি রেখে। বড় লোকের বড় ব্যাপার! নামকরা জ্যোতিষী এলেন নবদ্বীপ থেকে। কোষ্ঠী বিচার করে মত প্রকাশ করলেন তিনি, বসন্ত রায়ের শুভ রং নীল আর মতিলালের শুভ রং হলদে।

কাজেই বসন্ত রায়ের বাড়ির রং হল নীল আর নাম হল নীল-কুঠি। মতিলালের বাড়ির রং হল হলদে, আর নাম হল হলুদ-কুঠি। পরে কমল রায়ের আমলে নীল-কুঠির রং এবং নামের পরিবর্তন হল, রং হল লালচে, আর নাম হল জঙ্গল-কুঠি।

রমেনবাবুর শেষের কথাগুলো যেন তাপসের কানেই যায় নি, এমনি গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়েছিল তাপস। হঠাৎ চিন্তামগ্ন তাপসের মুখ থেকে বেরিয়ে এল আবৃত্তির সুকোমল সুর—

'গায়ে হলুদের শূন্য গায়
নীল-কুঠির নীল নেইকো তায়।'

রমেনবাবু অবাক হয়ে তাকালেন তাপসের দিকে। জিজ্ঞাসা করলেন, কি হল, তাপস? হঠাৎ তুমি কবি হয়ে উঠলে নাকি?

সহজ কণ্ঠে তাপস জবাব দিল, না কাকাবাবু। তবে কবিদের রচিত কবিতা আবৃত্তি করতে আমার ভাল লাগে। আচ্ছা কাকা-বাবু, বলতে পারেন জঙ্গল-কুঠির নীচে মাটির তলায় কোন গুপ্ত ঘর আছে কিনা?

সেকেলে জমিদার-বাড়ির মাটির তলায় গুপ্ত ঘর থাকাই স্বাভাবিক। তবে এ বাড়ির মাটির তলায় কোন গুপ্ত ঘর আছে বলে আমার জানা নেই।

জঙ্গল-কুঠি আর হলুদ-কুঠির মধ্যে কোন গুপ্ত সুড়ঙ্গ-পথের সংযোগ আছে বলে আপনি কোন দিন শুনেছেন?

এ রকম একটা কথা ছেলে-বয়সে শুনেছি বটে, তবে সে কথা কতদূর সত্যি বলতে পারি নে। তুমি বোধ হয় সুজিতের মুখে শুনে থাকবে, আমরা পুরুষানুক্রমে এই ষ্টেটের ম্যানেজার। কাজেই ছেলে বয়স থেকে আমি এই বাড়িতেই মানুষ হয়েছি। আমি যখন ছোট ছিলাম তখন চাঁদু লাঠিয়াল আমাদের ডাকাতির গল্প শোনাত। তারই মুখে শুনেছিলাম, জঙ্গল-কুঠি আর হলুদ-কুঠির মধ্যে গোপন সুড়ঙ্গ পথের সংযোগ আছে।

অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে রমেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার আর কিছু জানার আছে তাপস? আমার আবার আহারের সময় হল।

তাপস বলল, না কাকাবাবু, আপাতত আর কিছু জানবার নেই।

রমেনবাবু বিদায় নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই সুজিত চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করল, নীলের রহস্য পরিষ্কার হল তাপস?

হয়েছে। বলেই তাপস আবার সুরু করল কবিতা আবৃত্তি।

'গায়ে হলুদের শূন্য গায়, নীল-কুঠির নীল নেইকো তায়।
জলটুঙ্গিতে সেখান হতে, মাটির তলায় আধেক পথে,
পাথর চাপা মৃতের থান, হেঁয়ালিতে দিই নিশান॥'

পেয়েছি, পথের সন্ধান পেয়েছি, সুজিত! হেঁয়ালির অর্থ বুঝতে পেরেছি। উচ্ছ্বসিত হয়ে তাপস বলল, আজ আর কোন কাজ নয়! যা কিছু কাজ কালকে সকালে আবার নতুন করে সুরু করা যাবে। কাল সকালেই গোপন সুড়ঙ্গ-পথের অনুসন্ধান করব। তোর কোন প্রশ্নের জবাব আজ আর আমি দেব না! এখন রাতের আহার পর্ব শেষ করে বিশ্রামের কোলে আশ্রয় নেওয়া দরকার। তারপর ঘুম আর ঘুম।

তাপস মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

৯

পরদিন সকালে চায়ের কাপে প্রথম চুমুক দিয়ে তাপস বলল, নীল-কুঠির রহস্য উদ্‌ঘাটিত হওয়ায় হেঁয়ালির অর্থ অত্যন্ত সহজ হয়ে পড়েছে— তাই নয় কি, সুজিত ?

সুজিত বলল, হেঁয়ালির অর্থ বোঝা সহজ হয়ে পড়েছে—সন্দেহ নেই, কিন্তু গুপ্তধনের রহস্য এখনও রহস্যময় হয়ে রয়েছে।

তাপস বলল, কেন ? গুপ্তধন-রহস্যের আর অস্পষ্টতা রইল কোথায় ? পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, নীল-কুঠি, মানে বর্তমান জঙ্গল-কুঠি থেকে যে রত্ন-সিন্দুক নিয়ে যাওয়া হয়েছিল হলুদ-কুঠিতে, সেই সিন্দুক হলুদ-কুঠিতে নেই। জলটুঙ্গি আর হলুদ-কুঠির সঙ্গে মাটির তলায় যে গুপ্ত সুড়ঙ্গ-পথের সংযোগ আছে, সেই সুড়ঙ্গ-পথের মাঝামাঝি কোন জায়গায় পাথর চাপা আছে রত্ন-সিন্দুক। মতিলালের মৃতদেহ আর রত্ন-সিন্দুক একই সঙ্গে পোঁতা আছে পাথরের তলায়। গুপ্তধন সম্পর্কে এত কথা জানতে পেরেও যদি তুই বলিস, গুপ্তধনের রহস্য এখনও রহস্যময় হয়ে রয়েছে, তাহলে আমি ধরে নেব তোর মাথায় সার পদার্থ বলে কোন বস্তু নেই।

সুজিত বলল, গুপ্তধনের সন্ধান পাওয়া গেছে ঠিকই, কিন্তু সুড়ঙ্গ-পথের সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নি। সুড়ঙ্গ-পথ সম্পর্কে বসন্ত রায় কোন নির্দেশ বা ইঙ্গিত দিয়ে যান নি। সুড়ঙ্গ-পথের সন্ধান না পেলে গুপ্তধন-রহস্য চির রহস্যাবৃত রয়ে যাবে। এখন সুড়ঙ্গ-পথের সন্ধান কে দেবে ?

অত্যন্ত দৃঢ় কণ্ঠে তাপস বলল, সুড়ঙ্গ-পথ যদি সত্যিই থেকে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই সে পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। আমি দেব সে পথের সন্ধান। সুড়ঙ্গ-পথ অনুসন্ধানের ভার আমার ওপরে ছেড়ে দে, সুজিত! ওটা নিয়ে তোর মাথা না ঘামালেও চলবে।

চা খাওয়া শেষ করে তাপস জিজ্ঞাসা করল, জলটুঙ্গিটা কার অংশে পড়েছে, সুজিত? তোর অংশে না অরুণকুমারের?

জলটুঙ্গিটা আমার দখলে। ওতে অরুণের কোন অধিকার নেই।

জলটুঙ্গিটা ব্যবহার করা হয়, না এমনি পড়ে আছে?

গরমের দিনে মাঝে মঝে আমি জলটুঙ্গিতে গিয়েছি। মাস তিনেক হল ওটা তালাবন্ধ হয়ে রয়েছে।

আর কোন প্রশ্ন না করে তাপস লাল শঙ্খের ফটোটা মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল আবার।

মলয়ও ঝুঁকে পড়ে শঙ্খের ফটোটা দেখছিল। অল্পক্ষণ পরে সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, আমার ধারণা, বসন্ত রায় শঙ্খের ওপর খোদাই করা ছবির মধ্যেই. গুপ্ত সুড়ঙ্গ-পথের ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। শঙ্খের ভেতরের অংশে ওপরের দিকে দুটো বড় বাড়ির চিহ্ন আঁকা। বাড়ি দুটির গায়ে সমান্তরাল লাইনের মাঝে তীরযুক্ত বৃত্তের মধ্যে ৪ আর ২ সংখ্যা খোদাই করা। আমার ধারণা ঐ ৪ আর ২ সংখ্যা গুপ্ত সুড়ঙ্গ-পথের গোপন সঙ্কেত। ঐ ৪ আর ২ সংখ্যার রহস্য ভেদ করতে পারলেই সুড়ঙ্গ-পথ আবিষ্কার করা সহজ হয়ে পড়বে। নীচের অংশে গাছগাছালিতে ঘেরা ছোট্ট ঘরটা হচ্ছে জলটুঙ্গি।

তাপস হেসে বলল, ও সম্ভাবনাগুলো আমি অনেক আগেই চিন্তা করেছি, মলয়! কিন্তু ওপরের অংশের ছবি দুটো যে জঙ্গল-কুঠি আর হলুদ-কুঠির চিহ্ন সে বিষয়ে আমার মনে এখনও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ ও দুটোকে বাড়ির চিহ্ন না বলে জানলা বা বড়

শেল্‌ফের চিহ্ন বলা চলে। যদি ধরে নেওয়া যায় আমার অনুমান সত্যি, তাহলে ধরে নিতে হবে নিশ্চয়ই কোন জানলা বা শেল্‌ফ থেকেই সুরু হয়েছে গুপ্ত সুড়ঙ্গ-পথ। তখন অনুসন্ধান করে দেখতে হবে আমার অনুমান সত্যি কিনা। চল্ সুজিত, আমি তোর সমস্ত বাড়িটাই একবার ভাল করে দেখতে চাই।

বিশাল জঙ্গল-কুঠির প্রতিটি ঘর, অলিন্দ, বারান্দা, প্রতিটি কোণ গভীর ধৈর্য নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল তাপস। প্রতিটি জানলা, প্রতিটি শেল্‌ফ অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে দেখল। কিন্তু ফল কিছুই হল না। গোপন সুড়ঙ্গ-পথ গোপনই রয়ে গেল। সুড়ঙ্গ-পথের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

জানলাগুলো সব একই রকম, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শেল্‌ফগুলো একই ধরণের দেখতে।

দোতালায় হলঘরের একটা প্রকাণ্ড শেল্‌ফ তাপসের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তাপস মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল শেল্‌ফটা। অন্যগুলোর থেকে একটু স্বতন্ত্র ধরণের এটা। শেল্‌ফের সামনে দু'পাশে দুটি কারুকার্য করা কাঠের দণ্ড রয়েছে। ভিতরে কোন তাক নেই। দেখতে ছোটখাট একটা মন্দিরের মত। ভিতরে মাঝামাঝি জায়গায় বসান রয়েছে কালো পাথরে কোঁদা সুন্দর কালীমূর্তি। মূর্তিটির গঠন এত নিখুঁত, চোখের দৃষ্টি এত প্রাণবন্ত যে, মূর্তির চোখের দিকে তাকালেই নিজের চোখ যেন নত হয়ে আসে। এমন প্রাণবন্ত সুন্দর, সজীব মূর্তি তাপস এর আগে আর কোনদিন দেখে নি।

কালীমূর্তির দিকে তাপসকে মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে থাকতে দেখে সুজিত বলল, ওখান থেকে সরে আয়, তাপস !

সুজিত তাপসের হাত ধরে টেনে আনল সেখান থেকে।

তাপসের মন থেকে তখনও মুগ্ধ বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি।

তাপস বলল, অমন সুন্দর অথচ ভয়ঙ্কর ভীষণদর্শনা কালীমূর্তি কোথা থেকে জোগাড় করলি, সুজিত? অমন নিখুঁত পাথরের মূর্তি আমার চোখে আজ পর্যন্ত পড়ে নি।

সুজিত জবাব দিল, কালীমূর্তি আমি জোগাড় করি নি। বসন্ত রায় জোগাড় করেছিলেন এ মূর্তি। শুনেছি, বসন্ত রায়ের আমল থেকে ঐ মূর্তি ওখানেই আছে। বসন্ত রায় নিজেই নাকি পূজো করতেন ঐ মূর্তি। মূর্তির চোখের দিকে বেশিক্ষণ তাকাবে না, সব সময় তাকাবে পায়ের দিকে—মূর্তি সম্পর্কে আমার পূর্বপুরুষদের এই নির্দেশ দেওয়া আছে।

সুজিতের কথায় বিস্ময় প্রকাশ করল তাপস, কিন্তু মূর্তি সম্পর্কে আর কোন মত প্রকাশ করল না। সম্পূর্ণ অন্য কথা পাড়ল সে। বলল, এখানের কাজ শেষ হয়েছে সুজিত, চল্ একবার জলটুঙ্গিটা দেখে আসি।

ডান দিকের বাগানের শেষ প্রান্ত থেকে ঝিলের সুরু। লম্বায় চওড়ায় ঝিলটা প্রকাণ্ড। ঝিলের মাঝামাঝি জায়গায় খুব ছোট দ্বীপের মত খানিকটা জমি জলের উপর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। দ্বীপের উপর উঁচু চত্বরে জলটুঙ্গির ছাঁদে গড়া একখানি মাত্র পাকা গোলাকৃতি ঘর।

তাপসকে সঙ্গে নিয়ে সুজিত ঝিলের ধারে এসে দাঁড়াল।

ঝিলের ধারে একটা খুঁটিতে লোহার চেন বাঁধা রয়েছে, আর সেই চেনের অপর প্রান্ত একটা ছোট্ট বোটের মধ্যে দিয়ে গলিয়ে, বাঁধা হয়েছে জলটুঙ্গির গায়ে—আটকান একটা লোহার আওটায়। তাপসকে সঙ্গে নিয়ে বোটে উঠে সুজিত লোহার চেনটা টানতেই বোটটা তর তর করে এগিয়ে গেল জলটুঙ্গির দিকে।

বিশাল ঝিলের বুকে জলটুঙ্গিটাকে সত্যই সুন্দর দেখাচ্ছিল।

বেশ প্রশস্ত একখানা গোলাকৃতি ঘর। ঘরটার চতুর্দিকে বেশ সুন্দর ধরণের রেলিং দিয়ে গোল করে সাজানো বারান্দা।

তাপস্ আর সুজিত উঠে এলো জলটুঙ্গির বারান্দায়।

প্রকাণ্ড দরজায় তালা লাগান ছিল। তালা খুলে ঘরে ঢুকে এক এক করে সমস্ত দরজা জানলা খুলে দিল সুজিত।

তাপস ঘরের ভিতরটা ভাল করে দেখল।

ঘরে আসবাবপত্র তেমন কিছু নেই। ঘরের শেষ প্রান্তে দেয়ালের ধার ঘেঁষে একটা সুন্দর কারুকার্য করা তক্তাপোষ পাতা রয়েছে। দক্ষিণ দিকের একটা জানলার ধারে গদিমোড়া একটা আরাম-কেদারার সামনে রয়েছে একটা ছোট্ট টেবিল। সামনের একটা শেল্‌ফে কিছু বই সাজানো রয়েছে।

মেঝেতে পুরু ধূলোর স্তর জমেছে। সেই ধূলোর উপর এক জোড়া পায়ের ছাপ দেখতে পেল তাপস, আর দেখতে পেল একটা লম্বা সরু দাগ ঘরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে চলে গেছে। পায়ের ছাপগুলো আর লম্বা দাগ শেষ হয়েছে একটা শেল্‌ফের সামনে। শেল্‌ফটা অপর প্রান্তের কোণের দিকে থাকায় এতক্ষণ নজরে পড়েনি তাপসের।

বিস্মিত দৃষ্টিতে শেল্‌ফটার দিকে তাকিয়ে রইল তাপস।

একেবারে একই ধরণের শেল্‌ফ। যেমনটি দেখেছিল তাপস জঙ্গল-কুঠির দোতলার হল-ঘরে, ঠিক তেমনি। একই রকম কাঠের উপর কারুকার্য করা মন্দিরের মত দেখতে শেল্‌ফটা। সামনে দু'টি কোঁদা কাঠের দণ্ড খুঁটির উপরে চালের ভার বহন করছে, ভিতরে কোন তাক নেই। শেল্‌ফটার মাঝখানে বসান রয়েছে পাথরে কোঁদা একটা কালীমূর্তি। এ মূর্তি কিন্তু হল-ঘরের মূর্তির মত অত প্রাণবন্ত, অত ভীষণদর্শনা নয়।

তাপস শেল্ফের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে পিছনের তক্তার উপর মৃদু মৃদু আঘাত করতে লাগল আর ঐ শব্দ শুনতে লাগল অত্যন্ত সতর্ক ভাবে।

তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে শেল্ফের কালীমূর্তির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ সুজিতের হাতের স্পর্শে তাপস সচেতন হয়ে উঠল। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল সুজিতের দিকে।

সুজিত বলল, এটিও বসন্ত রায়ের কালীমূর্তি। ভীষণ কালীভক্ত ছিলেন তিনি। আর গরমের দিনে অবসর সময় কাটাতেন এই জলটুঙ্গিতে। মূর্তিটি তিনিই এখানে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

সুজিতের কথা মন দিয়ে শুনল তাপস; কিন্তু কোন মন্তব্য প্রকাশ করল না। কয়েক মুহূর্ত কি যেন চিন্তা করে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা ঠিক কতদিন আগে শেষবার জলটুঙ্গিতে এসেছিলি, তোর মনে আছে ?

না, তা ঠিক মনে নেই—তবে খুব বেশিদিন হয়নি, মাস তিনেক হবে বোধ হয়।

ধূলোর উপর পায়ের ছাপগুলোর দিকে সুজিতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাপস আবার জিজ্ঞাসা করল, এগুলো কার পায়ের ছাপ, বলতে পারিস ? শেষ যেদিন এখানে এসেছিলি, সেদিন তোর সঙ্গে অন্য কেউ ছিল কি ?

ছাপগুলোর দিকে বিস্মিত দৃষ্টিপাত করে সুজিত বলল, সেদিন অন্য আর কেউ আমার সঙ্গে ছিল বলে মনে পড়ছে না—তবে একজন চাকর ছিল সঙ্গে। ঘরটা সে ঝেড়ে মুছে দিয়েছিল সেদিন।

তাপসের কণ্ঠ থেকে ছোট্ট একটি শব্দ বেরিয়ে এলো, হুম্।

অবাক হয়ে সুজিত তাকাল তাপসের দিকে। জিজ্ঞাসা করল, কি হল, তাপস ? অমন হুম্ হুম্ করছিস্ কেন ?

রহস্যময় কণ্ঠে তাপস বলল, অরুণকুমার তোর থেকে ঢের বুদ্ধিমান, সুজিত! খুব সম্ভব গুপ্ত সুড়ঙ্গ-পথের সন্ধান পেয়েছেন। হয়ত এতক্ষণে রত্ন-সিন্দুকও হাতিয়ে নিয়েছেন তিনি! ঘরের মেঝেতে পায়ের ছাপ আর লম্বা ফিতের চিহ্ন দেখে আমার তাই মনে হচ্ছে। অরুণকুমার হয়ত গুপ্ত সুড়ঙ্গ-পথের সন্ধান আগের থেকেই জানতেন।

তুই কি বলছিস, তাপস?

যা বলছি—ঠিকই বলছি, সুজিত! এখন চল তাড়াতাড়ি কুঠিতে ফিরে যাই। দোতলার হল-ঘরের কালীমূর্তিটা আমি আর একবার পরীক্ষা করতে চাই।

একরকম জোর করেই সুজিতের হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল তাপস।

১০

জঙ্গল-কুঠিতে ফিরে এসে তাপস সোজা উঠে গেল দোতলার হল-ঘরে। দ্রুতপায়ে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল কোণের সেই মন্দিরাকৃতি শেল্‌ফটার সামনে। পরীক্ষকের তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিয়ে তাকাল শেল্‌ফের ভিতরের ভয়ঙ্করী ভীষণদর্শনা কালীমূর্তির দিকে।

কেমন যেন একটা আকর্ষণী শক্তি আছে মূর্তির দৃষ্টিতে। তাপসের তীক্ষ্ণদৃষ্টি ক্রমশঃ কেন্দ্রীভূত হতে লাগল মূর্তির চোখের উপর। পাষাণ-মূর্তির দিকে তাকিয়ে তাপস নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মূর্তির চোখের দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মত তাপসকে তাকিয়ে থাকতে দেখে সুজিত ওর হাত ধরে মৃদু টান দিল। বলল, মূর্তির চোখের দিকে তাকানো নিষেধ আছে, তাপস!

তাপসের দিক থেকে কোন সাড়া এল না। তেমনি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে।

সুজিত তাপসের হাতে জোরে জোরে ঝাঁকুনি দিতে লাগল। চাপা কণ্ঠে বলতে লাগল, ওদিকে নয় তাপস, আমার দিকে তাকা! শুনছিস্ তাপস? শুনতে পাচ্ছিস্‌ না?

সুজিতের ঝাঁকুনিতে তাপসের হুঁশ ফিরে এল যেন। মূর্তির চোখের উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এনে সে তাকাল সুজিতের দিকে!

তাপসের দৃষ্টি কেমন যেন ভাববিহ্বল।

ভয় পেয়ে সুজিত বলল, মূর্তির চোখের দিকে অমন করে তাকাস নে তাপস, পাগল হয়ে যাবি।

পাগল হয়ে যাব? মৃদু হাসল তাপস। বলল, অত সহজে তাপস চৌধুরী পাগল হবে না, সুজিত! কিন্তু সত্যি আশ্চর্য!

আশ্চর্য কি?

কালীমূর্তির চোখ। তাপস বলল, পাথর কেটে যিনি মূর্তি গড়েছেন তিনি সত্যিই উঁচু দরের সাধক শিল্পী।

সত্যি তাই। মূর্তির চোখে যেন প্রাণ আছে, চোখের দিকে অল্পক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মনে হবে যেন চোখের তারা দুটো স্পন্দিত হচ্ছে।

তাপস বলল, মলয় বোধ হয় নীচেয় লাইব্রেরী ঘরে আছে, তাকে একবার ডেকে আন, সুজিত। শাঁখের ফটো আর লেন্সটাও নিয়ে আসতে বলিস।

সুজিত ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই তাপস কর্মব্যস্ত হয়ে পড়ল।

শেল্‌ফের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে পিছনের তক্তার উপর মৃদু আঘাত করতে লাগল ধীরে ধীরে। শব্দ শুনতে লাগল অত্যন্ত সতর্ক হয়ে।

তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কালীমূর্তির পা দুটি ডান হাতে চেপে ধরে তোলবার চেষ্টা করল। কিন্তু মূর্তি উঠল না। তাপস বুঝতে পারল, মূর্তিটা শেল্‌ফের মেঝের সঙ্গে গাঁথা। ঘোরাবার চেষ্টা করল, ঘুরল না।

অবশেষে বেশ কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে কালীমূর্তির পায়ের উপর দৃষ্টিপাত করতেই তাপস আবার নতুন করে আবিষ্কার করল সামনের কারুকার্য করা খুঁটি দুটোকে। মূর্তি আর খুঁটি দুটো তিনটি সমকোণে রয়েছে।

একভাবে সে তাকিয়ে রইল খুঁটি দুটোর দিকে। হাসির রেখা ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে।

ঘরে এল সুজিত আর মলয়।

তাপস জিজ্ঞাসা করল, ফটোটা এনেছিস, মলয় ?

মলয় ফটোটা তাপসের হাতে দিল।

ফটো হাতে নিয়ে তাপস শেল্‌ফের সামনে গিয়ে ফটোর সঙ্গে মিলিয়ে কি সব পরীক্ষা করে বলল, একেবারে এক। একই রকমের কারুকার্য করা।

কি একই রকম ? সুজিত প্রশ্ন করল।

তাপস বলল, শেল্‌ফের খুঁটি। শাঁখের ওপরের অংশে আঁকা যে ছবি দুটোকে আমরা বাড়ি বলে অনুমান করেছিলুম, আসলে সে দুটো খুঁটি। ফটোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখ তোরা।

সরে দাঁড়াল তাপস।

সুজিত আর মলয় পরীক্ষকের দৃষ্টি নিয়ে শেল্‌ফের সামনে এল।

মলয় কোন মত প্রকাশ করল না। সুজিত বলল, শঙ্খে আঁকা থাম দুটোর কারুকার্যের সঙ্গে শেল্‌ফের কারুকার্য করা খুঁটি দুটোর আশ্চর্য মিল রয়েছে দেখছি। দুটো ঠিক একই রকম !

মৃদু হেসে মলয়ের কাছ থেকে লেন্সটা নিয়ে পরম উৎসাহে তাপস খুঁটি দুটো পরীক্ষা করতে লাগল।

বেশ কিছুক্ষণ সময় কেটে গেল।

লেন্সটা জামার পকেটে রেখে তাপস চিন্তিত মনে শেল্‌ফের বাঁ দিকের খুঁটির উপরের এক জায়গা ধরে মোচড় দিয়ে নীচের দিকে ঘোরাবার চেষ্টা করল। এই অংশটা বলের মত গোলাকার।

তাপসের বলিষ্ঠ হাতের তীব্র চাপে ওই অংশটা ধীরে ধীরে নীচের দিকে ঘুরতে লাগল। পর পর চারপাক ঘোরানোর পর ডান দিকে নীচের একটা অংশ বেশ শক্ত করে ধরে ডান দিকে ঘোরাবার চেষ্টা করল সে। এবারও সফল হল। ঘুরতে লাগল ধীরে ধীরে সেই অংশটা। ঘোরানো শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটতে দেখা গেল।

প্রথমে শোনা গেল মৃদু ঘড় ঘড় শব্দ। পরমুহূর্তে গোটা শেল্‌ফটা একবার কেঁপে উঠল। তারপর ভোজবাজির মত অল্পক্ষণের মধ্যেই অত বড় শেল্‌ফ দেওয়ালের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল। অদৃশ্য শেল্‌ফের জায়গাটা এখন কপাটহীন দরজার মত দেখাতে লাগল।

বিস্মিত সুজিতের কণ্ঠ ভেদ করে একটি মাত্র শব্দ বেরিয়ে এল, সুড়ঙ্গ-পথ!

তাপসের ঠোঁটে দেখা দিয়েছে সফলতার হাসি। সে বলল, এই সেই সুড়ঙ্গ-পথ! অবশেষে সন্ধান পাওয়া গেল তাহলে! গুপ্ত সুড়ঙ্গ-পথের মত যদি গুপ্তধনের কাহিনী সত্যি হয়, তবে গুপ্তধনের সন্ধানও পেয়ে যাব আমরা। অবশ্য অরুণকুমার যদি গুপ্তধন আবিষ্কার না করে থাকেন—এতদিনেও।

সুজিত জিজ্ঞাসা করল, আমাদের আগে গুপ্তধন পাবার কোন সম্ভাবনা অরুণকুমারের আছে নাকি?

যথেষ্ট। তাপস বলল, কারণ আমাদের আগে অরুণকুমার গুপ্ত সুড়ঙ্গ-পথের সন্ধান পেয়ে গেছেন যে।

১১

টর্চের তীব্র আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল সুড়ঙ্গ-পথের প্রবেশমুখ। আলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভিতরটা দেখতে লাগল তাপস।

ধাপের পর ধাপ সরু ঘোরানো গোলাকৃতি সিঁড়ি নীচের অন্ধকার গহ্বরে নেমে গেছে। টর্চের আলোয় যতদূর নজর চলে—দেখবার চেষ্টা করল তাপস। কিন্তু সিঁড়ির শেষে কি আছে দেখতে পেল না সে। সিঁড়ির শেষের ধাপগুলো অন্ধকারে মিশে গেছে। দৃষ্টি চলে না সেখানে আর।

তাপসের ইঙ্গিতের অপেক্ষায় নীরবে দাঁড়িয়ে রইল মলয় আর সুজিত।

কিছুক্ষণ কি যেন চিন্তা করল তাপস। তারপর মলয় আর সুজিতকে ইঙ্গিতে অনুসরণ করতে বলে তাপস দেয়ালের ফাঁকের মধ্যে প্রবেশ করল।

জ্বলন্ত টর্চের আলোয় পথ দেখে সরু সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে লাগল ওরা।

অবশেষে সত্যই সুড়ঙ্গ-পথের সন্ধান পাওয়া গেল।

সিঁড়ির শেষ ধাপ এসে মিশেছে ছোট্ট একটা চৌকো ঘরে। আর সেই ঘরের এক প্রান্ত থেকে সুরু হয়েছে সুড়ঙ্গ-পথটা।

সুড়ঙ্গ-পথ ধরে সাবধানে এগিয়ে চলল সবাই।

খানিকটা চলবার পর তারা একটা বাঁকের মুখে এল। তাপস হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল সেখানে। এখান থেকে পথটা মোড় ঘুরেছে। অবাক

হয়ে তাপস দেখল, বাঁকের মুখে ছড়িয়ে পড়েছে মৃদু আলোর আভাস। সাবধানী তাপস জ্বলন্ত টর্চটা নিভিয়ে ফেলল। হাতের ইঙ্গিতে মলয় আর সুজিতকে স্থির হয়ে দাঁড়াতে বলে সে নিজেও নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ।

তাদের আসার আগে সুড়ঙ্গ-পথে অন্য কেউ প্রবেশ করেছে নিশ্চয়ই। কিন্তু কে সে? অরুণকুমার? একমাত্র অরুণকুমারের পক্ষেই সম্ভব গুপ্ত সুড়ঙ্গ-পথে প্রবেশ করা। সব চেষ্টাই কি তবে বিফল হবে ওদের? চিন্তিত হয়ে পড়ল তাপস।

তাপসের কানের কাছে মুখ এনে ফিস্-ফিস্ করে মলয় বলল, আমাদের আগে এ-পথে আর কেউ ঢুকেছে বোধ হয়।

তাপস বলল, হ্যাঁ। আলোর আভাস দেখে তাই মনে হচ্ছে। আমি আগেই অনুমান করেছিলুম এটা। কাজেই এখানে অরুণ-কুমারকে দেখলে একটুও আশ্চর্য হব না।

নিঃশব্দে কাটল কয়েক মুহূর্ত। তারপর দেয়ালের ধার ঘেঁসে অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রেখে নিঃশব্দে এগিয়ে চলল ওরা আলোর রেখা লক্ষ্য করে।

এরকম একটা নিঃশব্দ অভিযানে সুজিত একেবারে অনভ্যস্ত। তাই বোধ হয় ওর চলার মৃদু শব্দ হয়েছিল। শব্দটুকু ধরা পড়ল তাপসের সজাগ সতর্ক কানে।

নিঃশব্দে আয় সুজিত! তাপস সাবধান করে দিল। পায়ের শব্দ যেন না হয়।

খানিক এগিয়ে তাপস মলয়কে জিজ্ঞাসা করল, তোর রিভলভার তৈরী আছে তো?

চাপা গলায় মলয় বলল, হ্যাঁ!

আরও খানিকটা এগিয়ে তাপস থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল আবার।

অল্প দূরে গ্যাসের একটা আলো জ্বলতে দেখা গেল। সেই আলোর সামনে বসে একজন সুদর্শন যুবক একটা নোটবুকে কি যেন লিখছেন। যুবকের পরনে প্যাণ্ট আর হাফশার্ট।

বিস্মিত সুজিত অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে বলল, অরুণকুমার!

সুজিতের মুখে হাতের মৃদু চাপ দিয়ে তাপস বলল, চুপ কর, কথা বলিস নে।

দেয়ালের সঙ্গে গা মিলিয়ে ওরা চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল অরুণকুমারকে।

এক সময় সহসা অরুণকুমার লেখা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে একটা গজ বের করে দেয়ালের গা মাপলেন। মাপা শেষ করে নোট-বুকে কি সব লিখে আবার মাপ শুরু করলেন। এবার মাপবার সময় চক্ দিয়ে পাথরের দেয়ালের গায়ে কয়েকটা দাগ দিলেন অরুণকুমার!

তারপর একটা বড় হাতুড়ি মেঝে থেকে তুলে নিয়ে দেয়ালের পাথরের উপর ঘা মারতে লাগলেন। অল্পক্ষণ পরে একটা বড় চৌকো পাথর দেয়াল থেকে খুলে গেল!

পেয়েছি—পেয়েছি। অরুণকুমার আনন্দে চীৎকার করে উঠলেন।

সুজিতের চাপা কণ্ঠ ভেদ করে বেরিয়ে এল একটি মাত্র শব্দ, গুপ্তধন!

চাপা কণ্ঠে গর্জন করে উঠল তাপস, চুপ।

তারপর সব নিস্তব্ধ, নিঝুম। কারুর মুখে কথা নেই। নিঃশ্বাসের শব্দটুকুও বোধ করি শোনা যাচ্ছে না।

শুধু নীরব প্রতীক্ষা। এরপর কি ঘটবে—কি দেখা যাবে, তারই জন্যে সামনের দিকে ব্যগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল ওরা।

সফলতার আনন্দোচ্ছ্বাস বোধ করি ততক্ষণে কেটে গিয়েছিল অরুণকুমারের।

পরমুহূর্তে বিপুল উৎসাহে নতুন উদ্যমে মেঝে থেকে গাঁইতিটা তুলে অরুণকুমার দেয়ালের পাথর খোলা অংশে আঘাতের পর আঘাত করতে লাগলেন।

গাঁইতির আঘাতে চাপ চাপ মাটি খুলে পড়তে লাগল দেয়াল থেকে। খোলা মাটি মেঝেতে স্তূপীকৃত হতে লাগল ক্রমশঃ। পাথর খোলা দেয়ালের ফাঁকে সৃষ্টি হল বিরাট এক গহ্বর। কিন্তু বসন্ত রায়ের রত্ন-সিন্দুকের সন্ধান পাওয়া গেল না তখনও।

পরিশ্রমে, ক্লান্তিতে একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন অরুণকুমার। সারা দেহ ভিজে গেছে ঘামে। বোধ হচ্ছে, এক নাগাড়ে গাঁইতি চালিয়ে অবশ হয়ে গেছে হাত দুটো!

এবার গাঁইতিটা মেঝেতে ফেলে দিয়ে দেয়ালের গর্তের মধ্যে ঝুঁকে পড়ে অরুণকুমার পাগলের মত রত্ন-সিন্দুক খুঁজতে লাগলেন।

মিনিটের পর মিনিট কাটতে লাগল নীরব প্রতীক্ষায়।

অবশেষে অরুণকুমার দেহের উপরাংশ গর্তের ভিতর থেকে বের করে আনলেন। রিক্ত হস্ত। হতাশার চিহ্ন ফুটে উঠেছে তাঁর ক্লান্ত, বিষণ্ণ মুখে। পরিশ্রান্ত হয়ে মেঝের উপর বসে পড়লেন তিনি।

নিঃশব্দে কাটল আরও কয়েকটি মুহূর্ত।

অরুণকুমার চীৎকার করে উঠলেন পাগলের মত, সব মিথ্যে—মিথ্যে—মিথ্যে—। গুপ্তধনের কাহিনী অবিশ্বাস্য, উদ্ভট কল্পনা। সব কিছু ফেলে আলো নিয়ে এগিয়ে চললেন তিনি সামনের দিকে।

মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল তাপসের ঠোঁট জোড়ায়।

ইঙ্গিতে মলয় আর সুজিতকে সেখানে অপেক্ষা করতে বলে তাপস অনুসরণ করল অরুণকুমারকে।

প্রায় দশ মিনিট পরে ফিরে এল তাপস।

মলয় আর সুজিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তাকাল তাপসের দিকে।

তাপস মৃদু মৃদু হাসতে লাগল, কিছু বলল না।

ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল সুজিতের। জিজ্ঞাসা করল, রত্ন-সিন্দুকের কাহিনী অবিশ্বাস্য—উদ্ভট কল্পনা? বলে কী!

রহস্যময় হাসি হেসে বলল তাপস, আমার কিন্তু তা মনে হয় না।

তবে?

রত্ন-সিন্দুকের অনুসন্ধান করেছি আমরা ভুল পথে। বুদ্ধিমান, চতুর বসন্ত রায়ের রত্ন-সিন্দুক এত সহজে পাওয়া যাবে না, বন্ধু। বুদ্ধি খরচ করতে হবে, মাথা ঘামাতে হবে। হতাশ হলে চলবে না। আবার নতুন করে নতুন পথে অনুসন্ধান করতে হবে।

তাপস আবার মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

১২

তারপর দু'দিন কেটে গেছে।

দু'দিন একেবারে নীবর হয়ে আছে তাপস। দক্ষিণের বারান্দায় ইজিচেয়ারের উপর দেহ এলিয়ে দিয়ে সুদূর নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে চিন্তায় মগ্ন হয়ে। কারুর সঙ্গে কথা বলে না।

তাপসের সামনে ছোট্ট একটা টিপয়ের উপর রয়েছে লাল শঙ্খের এন্‌লার্জ করা ফটো আর বসন্ত রায়ের লেখা জীর্ণ চিঠিটা।

তাপসের মনের গভীরে বসন্ত রায়ের লেখা চিঠির একটি নির্দেশ বার বার উদয় হতে থাকে। '...শঙ্খের কারুকার্যের অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করিও কিন্তু কাহাকেও দেখাইও না !...'

ফটোটা চোখের সামনে তুলে ধরে পরীক্ষা করে গভীর মনোযোগ দিয়ে। তারপর একভাবে ফটোর দিকে নীরবে তাকিয়ে থাকে তাপস।

এবার উঠে দাঁড়ায় তাপস। বারান্দার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পায়চারি করে ঘুরে বেড়ায় চিন্তিত মনে।

এক সময় বারান্দার অপর প্রান্ত থেকে সুজিতকে আসতে দেখে তাপস স্থির হয়ে দাঁড়াল।

তোকেই মনে মনে খুঁজছিলাম। বলল তাপস।

সুজিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তাকাল তাপসের দিকে।

দেখ সুজিত, শাঁখটা আমাদের চাই-ই। ওটা না পেলে নতুন করে গুপ্তধনের অনুসন্ধান করা একেবারে অসম্ভব।

কিন্তু সে তো অরুণকুমারের কাছে।

তা আমি জানি। অরুণকুমারের কাছ থেকে উদ্ধার করতেই হবে ওটা।

কিন্তু কিভাবে?

যে ভাবে হোক। যেমন করে হোক শাঁখটা আমাদের চাই।

বেশ। আমাকে কি করতে হবে, বল?

একটু চিন্তা করে নিয়ে তাপস জিজ্ঞাসা করল, অরুণকুমারকে এখন বাড়িতে পাওয়া যাবে?

পাওয়া যেতে পারে। সাধারণতঃ এ সময়ে বাড়িতেই থাকে।

তাহলে যাওয়া যাক, চল।

তাপস আর সুজিত বেরিয়ে পড়ল।

অরুণকুমারের ভৃত্য মধুর দেখা পাওয়া গেল সদর দরজায়। সে সহাস্য অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল, আসুন আসুন!

সুজিত জিজ্ঞাসা করল, অরুণ বাড়িতে আছে, মধু?

মধু বলল, আছেন। আপনারা বসুন, আমি খবর দিই গে।

অল্পক্ষণ পরে মধু ফিরে এল। বলল, আপনারা আসুন—বাবু দোতলায় লাইব্রেরী ঘরে আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন।

দোতলার প্রকাণ্ড হল-ঘরটা অরুণকুমারের লাইব্রেরী।

একটা প্রকাণ্ড টেবিলের ওধারে বসেছিলেন অরুণকুমার। সুজিত আর তাপসকে দেখে উঠে অভ্যর্থনা জানালেন হাসিমুখে। বললেন, আসুন মামাবাবু, বসুন।

ওরা বসবার পর অরুণকুমার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন সুজিতের দিকে।

সুজিত বলল, প্রথমে আমার বন্ধু—তাপস চৌধুরীর সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই, অরুণ। এর নাম হয়ত তুমি শুনে থাকবে।

নমস্কার বিনিময়ের পর অরুণকুমার বললেন, তাপসবাবুর নাম আমি অনেকবার শুনেছি—এতদিন পরে আলাপের সৌভাগ্য হল।

মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন অরুণকুমার, তাপসবাবু, আপনি এমন দিনে আমাদের বুনো দেশে বেড়াতে এলেন, না ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে?

আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন অরুণবাবু! বেড়াবার মত অবসর পেলুম কৈ? অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়।

বিস্মিত হয়ে অরুণকুমার জিজ্ঞাসা করলেন, অর্থাৎ আপনি এখানে এসেছেন কোন অজানা রহস্যের অনুসন্ধানে?

অত্যন্ত স্পষ্ট কণ্ঠে উত্তর দিল তাপস, আপনার অনুমান সত্যি।

খুন, না ডাকাতি?

খুন-ডাকাতি নয়, ছোটখাট একটা চুরির তদন্ত-ভার নিয়ে এখানে আসতে হয়েছে। অবশ্য চুরিটা সাধারণ হলেও ওর মধ্যে যথেষ্ট বিশেষত্ব আছে।

তাই নাকি? অদ্ভুত তো! কিন্তু অমন একটা অনন্যসাধারণ চুরির ঘটনা সম্প্রতি আমি তো শুনিনি! আশপাশে কোথাও নয় নিশ্চয়ই?

আপনি হয়ত শোনেন নি, কিন্তু চুরি হয়েছে আপনার বাড়ির পাশেই।

পাশে! মানে, জঙ্গল-কুঠিতে?

হ্যাঁ। কয়েকদিন আগে সুজিতের বাড়িতে চুরি হয়েছে।

তাপস এবার সোজাসুজি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল অরুণকুমারের দিকে!

বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলেন অরুণকুমার। বললেন, কয়েকদিন আগে সন্ধ্যায় সুজিত-মামার খড়ের গাদায় কে যেন আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল শুনেছি—কিন্তু চুরি হয়েছে, এ কথা তো শুনি নি!

চোর নিজেই খড়ের গাদায় আগুন লাগায়। আগুন নেভাবার জন্যে বাড়ির সবাই যখন খুবই ব্যস্ত—সেই অবসরে চোর সরে পড়ে।

অদ্ভুত তো। বুদ্ধিমান চোর সন্দেহ নেই। কিন্তু কি চুরি হয়েছে—টাকা না সোনাদানা?

ও সব কিছু নয়। চুরি গেছে শুধু একটা লাল শঙ্খ।

লাল শঙ্খ! আশ্চর্য হলেন অরুণকুমার।

অবাক হচ্ছেন কেন অরুণবাবু? লাল শঙ্খের কিংবদন্তীর কাহিনী নিশ্চয়ই আপনি শুনেছেন?

ঠিক সেই মুহূর্তে কোন উত্তর না দিয়ে অরুণকুমার টেবিলের উপরে রাখা গ্লোবটি কাছে টেনে নিয়ে ধীরে ধীরে ঘোরাতে লাগলেন। তারপর অবার কি মনে করে সেটা যথাস্থানে সরিয়ে রেখে বললেন, লাল শঙ্খের কাহিনী আমার শোনা আছে। খুবই চিন্তার কথা, তাপসবাবু! তা—চোরের কোন সন্ধান পেলেন?

আবার গ্লোবটা কাছে টেনে নিলেন অরুণকুমার। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার বাংলা দেশের মানচিত্রটার উপর দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন।

তাপস উত্তর দিল, চোরের সন্ধান পেয়েছি।

গ্লোবটা যথাস্থানে রেখে অরুণকুমার বললেন, চোরের সন্ধান পেয়েছেন?

হ্যাঁ, পেয়েছি। শিক্ষিত, মার্জিতরুচি এক তরুণ শাঁখটা চুরি করেছেন। নাম চিন্তাহরণ রায়।

চিন্তাহরণ?—অদ্ভুত নাম তো!

অবিশ্যি চিন্তাহরণ নামটা আসল নয়—ওটা ছদ্মনাম।

ছদ্মনাম? আসল নামটাও জানতে পেরেছেন তাহলে?

হ্যাঁ, পেরেছি। চোরের আসল নাম অরুণকুমার। বর্তমানে হলুদ-কুঠির মালিক।

আপনি কি বলছেন, তাপসবাবু! প্রায় চীৎকার করে উঠলেন অরুণকুমার।

উত্তেজিত হবেন না, বসুন স্থির হয়ে। যা সত্যি, আমি তাই বলছি। শাঁখটা যে আপনিই চুরি করেছেন তার যথেষ্ট প্রমাণ আমার হাতে আছে। এমন সব প্রমাণ—যার সাহায্যে চুরির দায়ে আপনাকে স্বচ্ছন্দে গ্রেপ্তার করা যায়।

তাপসের কথা শুনে উত্তেজিত অরুণকুমার শান্ত হলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, আমি শঙ্খ চুরি করেছি, প্রমাণ যখন পেয়েছেন তখন সেই প্রমাণের সাহায্যে আমাকে পুলিসের হাতে দেবার বন্দোবস্ত করুন তাহলে।

তাপস মৃদু হাসল, বলল, কিন্তু সুজিত আপনাকে পুলিসের জিম্মায় দিতে চায় না।

সুজিত-মামা কি চান?

শাঁখটা ফেরৎ চায় শুধু।

ওটা কোন্ হিসেবে ফেরত চান সুজিত-মামা? ওটার ওপর ওঁর যতটুকু দাবী আছে ঠিক ততটুকু দাবী আমারও রয়েছে যে। বর্ণিত গুপ্তধনের মালিক তো আমার পূর্বপুরুষ—মতিলাল। তাঁকে খুন করে বসন্ত রায় অন্যায়ভাবে রত্ন-সিন্দুকটা আপন অধিকারে এনেছিলেন। সে অন্যায়ের প্রতিকার এতদিন হয়নি। শঙ্খটা ঠিক চুরি করিনি আমি। কৌশলে আমার পূর্বপুরুষের হৃত সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করেছি মাত্র। শঙ্খ আমি ডাকে ফেরত পাঠাতাম, কিন্তু এখন আর সম্ভব নয়। একটু থেমে অরুণকুমার আবার বললেন, দেখুন তাপসবাবু, শঙ্খের রহস্যময় হেঁয়ালির নির্দেশ অনুযায়ী আমি গুপ্তস্থান অনুসন্ধান করে দেখেছি, কিন্তু রত্ন-সিন্দুকের সন্ধান পাইনি। ওই গুপ্তধনের কাহিনী অবিশ্বাস্য, উদ্ভট কল্পনা বলেই আমার ধারণা

হয়েছে। কাজেই আমি মনে মনে স্থির করেছিলাম, শঙ্খটা ফেরত পাঠাব সুজিত-মামার কাছে। কিন্তু আপনার মত চতুর লোকের যখন শঙ্খ সম্পর্কে এতখানি আগ্রহ তখন আমার মনে সন্দেহ হচ্ছে, হয়তবা ওর পেছনে কিছু সত্যি লুকোনো আছে। সুতরাং আর একবার রহস্য উদ্‌ঘাটন করবার চেষ্টা করব। কাজেই—

কাজেই ওটা আপনি এখন ফেরত দেবেন না ?

না। অত্যন্ত স্পষ্টকণ্ঠে অরুণকুমার জবাব দিলেন।

এই কি আপনার শেষ কথা ?

হ্যাঁ।

কিন্তু শাঁখটা যে আমাকে পেতেই হবে অরুণবাবু !

আমি নিরুপায় !

বেশ, চললাম তাহলে আমরা।

ধন্যবাদ !

১৩

মধ্য রাত্রির নিকষকালো অন্ধকারে সুদীর্ঘ কালো ভৌতিক ছায়া ফেলে নিঃশব্দ নিঝুম হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল হলুদ-কুঠি। ঠিক এমন সময়েই বাগানের শেষ প্রান্তের একটা ঘন মাধবী-কুঞ্জের অন্তরালে আত্মগোপন করে এক ছায়ামূর্তি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল প্রাচীন আমলের ওই বাড়িটার দিকে।

ছায়ামূর্তির সুদীর্ঘ সবল দেহ কালো পোশাকের আবরণে ঢাকা। চোখ আর মুখের কিছু অংশ ঢাকা পড়েছে মুখোসের আবরণে। হাতে পরা রয়েছে কালো দস্তানা।

সুযোগের অপেক্ষায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সে।

অত বড় বাড়িটার কোথাও ক্ষীণতম আলোর শিখাও নেই! জেগে নেই কেউ। একেবারে নিঃস্তব্ধ—নিঝুম।

এই রকম একটা পরিবেশের জন্যেই অপেক্ষা করছিল ছায়ামূর্তি। অত্যন্ত সাবধানে চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে বাগানের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলল সে। অল্পক্ষণের মধ্যেই পৌঁছাল গাড়ী-বারান্দার নীচে।

গাড়ী-বারান্দার মোটা মোটা থামগুলোর গায়ে জড়িয়ে জড়িয়ে উপরের ছাদ পর্যন্ত উঠে গেছে মাধবী-লতার শক্ত লতানে ঝাড়।

মোটা দড়ির মত লতাগুলো ছায়ামূর্তির দেহের ভার বহন করতে সক্ষম হবে কিনা পরীক্ষা করে দেখে নিল সে। তারপর লতার সাহায্যে অত্যন্ত সহজে নিঃশব্দে উঠে গেল দোতলার বারান্দায়।

রেলিং-ঘেরা প্রশস্ত বারান্দা দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল সে।

বারান্দার দিকের শ্রেণীবদ্ধ দরজা জানলাগুলো সবই বন্ধ। সমস্ত অন্ধকার। কেমন যেন নিঃশব্দ—প্রাণহীন। যেন দরজা-জানালগুলোর ওদিকে ঘরের অভ্যন্তরে জীবন্ত প্রাণের কোন সাড়া নেই!

কোণের দিকের দরজার সামনে এসে নিঃশব্দে দাঁড়াল ছায়ামূর্তি।

হাতের স্পর্শে দরজার ওপরের অংশটা পরীক্ষা করে দেখল। অন্ধকারেও ভুল হয় নি তার। ঠিক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে সে।

সকালের দেখা বাহারী-কাচ-বসানো সেই দরজাটা!

নিঃশব্দে কাটল কয়েক মিনিট। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে মনে মনে হাসতে লাগল ছায়ামূর্তি। ঘটনার চক্রে পড়ে তাকে আজ চোরের ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছে।

চ্যালেঞ্জ। মৃদু হাসল ছায়ামূর্তি। চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে সে। পেছপা হলে চলবে না। অভীষ্ট জিনিস তার চাই। যেমন করে হোক। যে কোন উপায়ে হোক। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতেই হবে।

নিঃশব্দে একটা চেয়ার তুলে দরজার সামনে নিয়ে এসে সে উঠে দাঁড়াল তার উপরে। পকেট থেকে বের করল ছোট্ট একটি যন্ত্র। যন্ত্রটার সাহায্যে চৌকো করে কাটল দরজার উপরের একটা কাচ।

এবার কাটা কাচের চৌকো গর্তের মধ্যে দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ভিতরের ছিটকিনি অত্যন্ত সহজে খুলে ফেলল।

বন্ধ দরজা খুলে গেল।

সতর্ক দৃষ্টি আর সজাগ কান প্রস্তুত রেখে ছায়ামূর্তি সাবধানে ঘরে প্রবেশ করল।

এটা অরুণকুমারের দোতলার ঘর, তথা লাইব্রেরী।

অন্ধকার ঘরের মধ্যে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল ছায়ামূর্তি। তার সজাগ কান দুটো ঘরের ভিতরে কোনও ঘুমন্ত মানুষের নিঃশ্বাস শোনার জন্যে একাগ্র হয়ে উঠল।

না, ঘরের ভিতরে জীবন্ত মানুষের সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল না কোন ঘুমন্ত মানুষের অবস্থিতি।

পরমুহূর্তে তার হাতের টর্চটা জ্বলে উঠল। অন্ধকার ঘরের বুকে টর্চের তীব্র আলোর রেখায় সে দেখতে লাগল কোথায় কি আছে।

এই ঘরটাই অরুণকুমারের লাইব্রেরী।

দোতলার তিনটি মাত্র ঘর ব্যবহার করেন অরুণকুমার। দক্ষিণ দিকেরটা শোবার ঘর আর পূবদিকের ঘরটা হচ্ছে ল্যাবোরেটরী।

হল-ঘরের ছদিকের ছটো দরজা দিয়ে শোবার ঘরে এবং ল্যাবো-রেটারীতে যাওয়া যায়। দরজা ছটো ঠেলে দেখল ছায়ামূর্তি। ছ'দিকই বন্ধ রয়েছে।

নিশ্চয়ই অরুণকুমার এখনি গভীর ঘুমে অচেতন। সজাগ • সতর্ক পাহারা রাখার হয়ত প্রয়োজন মনে করেন নি। তাছাড়া ছায়ামূর্তি যে এত তাড়াতাড়ি তার অভীষ্ট জিনিস পুনরুদ্ধার করতে আসবে, এ কথা হয়ত চিন্তায় আসেনি অরুণকুমারের।

ছায়ামূর্তির অভীষ্ট বস্তুটি যে এই-ঘরেরই. কোন এক গোপন জায়গায় লুকোনো আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অন্তত ছায়ামূর্তির সুচিন্তিত দৃঢ় ধারণা তাই।

কিন্তু কোন্‌খানটায় আছে?

অন্ধকার ঘরের ভিতরে শুভ্র আলোর তীব্র রেখায় অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে ইতঃস্তত ঘুরে বেড়াতে লাগল ছায়ামূর্তি।

পরীক্ষকের তীক্ষ্ণদৃষ্টি বুলিয়ে চলল একের পর এক সন্দেহজনক জায়গাগুলোয়। বইয়ে ঠাসা দেয়াল-জোড়া শেল্‌ফগুলোর আনাচে কানাচে, টেবিল, চেয়ার, আলমারি আর ঘরের প্রতিটি কোণে কোণে, ঘরের অতি তুচ্ছতম স্থানেও অনুসন্ধান করতে লাগল।

প্রতিটি মূল্যবান্ মুহূর্ত কেটে চলল।

ছায়ামূর্তির বিরামহীন অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে যেন ক্লান্তি নেই।

অবশেষে আলোর রেখা এসে পড়ল দেয়ালে গাঁথা ষ্টীল-আলমারিতে। আলমারিটার উপরে স্থির দৃষ্টিপাত করল সে। কিন্তু কাছে এসে দেখল আলমারি নয়, দেয়ালে গাঁথা প্রকাণ্ড একটা লোহার সিন্দুক সেটা।

মধ্যরাত্রির অবাঞ্ছিত অতিথি সিন্দুকটার দিকে অবহেলাভরে তাকাল। ব্যঙ্গের হাসি ফুটে উঠল তার ঠোঁটে।

টর্চের আলোয় চলল ক্লান্তিহীন অনুসন্ধান।

কোথায় লুকিয়ে রাখতে পারে?

ছায়ামূর্তির চোখেমুখে ফুটে উঠেছে গভীর উৎকণ্ঠা আর উত্তেজনা।

যে কোন উপায়ে খুঁজে বের করতেই হবে। শঙ্খটা তার চাই।

সাধারণত মূল্যবান জিনিস যত্ন-সহকারে রাখা হয়—আর গোপনীয় হলে রাখা হয় লোহার-সিন্দুকে, আলমারির গোপন কোণে অথবা কোন গোপন জায়গায়। অরুণকুমারের মত ধূর্ত লোক ওসব জায়গায় নিশ্চয়ই রাখেন নি।

তবে কোথায়? ঘরের প্রকাণ্ড টেবিলের মোটা পায়াগুলোর দিকে নজর পড়ল ছায়ামূর্তির। পায়ার ভিতরে কোন গোপন জায়গায় লুকোনো নেই তো? দেয়ালের কোন গোপন গর্তে রাখাও অসম্ভব নয়।

যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব একের পর এক সন্দেহজনক স্থানগুলো পরীক্ষা করে চলল অতি যত্ন-সহকারে, অত্যন্ত সতর্ক হয়ে।

এতক্ষণ পরে টেবিলের উপর রাখা গ্লোবটার দিকে নজর পড়ল। ওটার ভিতরে নেই তো?

গ্লোবটা নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল গভীর মনোযোগ দিয়ে। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল, অস্পষ্ট কোন শব্দ শোনা যায় কিনা।

সতর্ক কানে শোনবার চেষ্টা করল ছায়ামূর্তি।

ইতিমধ্যে রাত এগিয়ে গেছে অনেকখানি।

শঙ্খটা এখনও পর্যন্ত খুঁজে না পাওয়া গেলেও হতাশা নেই ছায়ামূর্তির মনে···ক্লান্তি নেই কিছুমাত্র।

পকেট থেকে একটা ছোট্ট হাতুড়ী বের করে দেয়ালের সন্দেহজনক স্থানগুলোতে মৃদু মৃদু আঘাত করতে লাগল. শব্দ শুনতে লাগল সতর্ক সজাগ কান দিয়ে।

সহসা কার যেন পায়ের মৃদু শব্দ হল।

কে! আতঙ্কিত ছায়ামূর্তি পিছন ফিরে দেখল, অরুণকুমার স্থির শান্ত দৃষ্টিতে তার সামনে দাঁড়িয়ে।

ওঁর দৃঢ়মুষ্টিতে ধরা রয়েছে উদ্যত রিভলভার।

ছায়ামূর্তি তীক্ষ্ণদৃষ্টি ফেলল অরুণকুমারের মুখের উপরে।

ভয় বা আতঙ্কের কোন রকম চিহ্ন দেখা গেল না অরুণকুমারের চোখে-মুখে। দৃঢ় ও কঠিন হয়ে উঠল মুখ আর দৃষ্টি।

আরও খানিকটা কাছে এগিয়ে এলেন অরুণকুমার। বিস্ময়ে তাঁর চোখের উপরের ভ্রুজোড়া বিস্ফারিত হয়েছে শুধু।

রিভলভারের লক্ষ্য স্থির রেখে বাঁ-হাতের জ্বলন্ত টর্চের আলোয় ছায়ামূর্তির আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে অরুণকুমার জিজ্ঞাসা করলেন, কে তুমি?

কোন জবাব দিল না ছায়ামূর্তি। কেমন যেন ভগ্নোৎসাহের মত দেখাল তার মুখের চেহারা।

১৪

চাপা গর্জন করে উঠে অরুণকুমার জিজ্ঞাসা করলেন, কথা বল, জবাব দাও—কে তুমি ?

মুখোসের অন্তরাল থেকে উদ্যত রিভলভারের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল ছায়ামূর্তি, আপনার রিভলভারের মুখ একটু অন্য দিকে ঘুরিয়ে ধরুন। আমার বড় ভয় করছে—সত্যি বলছি, আমার ভীষণ ভয় হচ্ছে। আমি অত্যন্ত নার্ভাস লোক।

সগর্জনে বললেন অরুণকুমার, নার্ভাস লোক কিনা জানি নে, কিন্তু তুমি যে অত্যন্ত চতুর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যা হোক, এখানে কি করছিলে, তাই বলো ? কিসের সন্ধানে এসেছিলে ?

কোন কিছুরই সন্ধান করছিলুম না—ঘুরে-ফিরে দেখছিলুম শুধু! আর মনে মনে ভাবছিলুম আমি ভুল করে এখানে এসে পড়েছি।

ভুল করে ?

হ্যাঁ—তাই। রহস্যময় কণ্ঠে ছায়ামূর্তি বলল, জঙ্গল-কুঠিতে প্রবেশ করা আমার উদ্দেশ্য ছিল। এখন দেখছি ভুল করে হলুদ-কুঠিতে প্রবেশ করেছি। দুটো বাড়ি একই রকম দেখতে—তাই অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারি নি।

গভীর রাতে জঙ্গল-কুঠিতে কি উদ্দেশে প্রবেশ করতে চাইছিলে —সেটা নিশ্চয়ই বলতে তোমার আপত্তি নেই ?

যথেষ্ট আপত্তি আছে। দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন।

অসম্ভব। ছেড়ে দিতে পারি নে।

কি করতে চান তাহলে ?

পুলিসের হাতে তুলে দিতে চাই তোমাকে। কিন্তু তার আগে তোমার আসল পরিচয়টা জানা দরকার, কে তুমি ! আমার কেমন যেন ধারণা হচ্ছে—তুমি স্বয়ং তাপস চৌধুরী।

মোটেই নয়।

কেন ?

শুনেছি, তাপস চৌধুরী একজন শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা, কিন্তু আমার মত নিশাচর নয়।

কিন্তু প্রয়োজনের খাতিরে মানুষকে অনেক কিছুই করতে হয়। তুমি তাপস চৌধুরীই হও বা তার নিয়োজিত কোন গুপ্তচর হও— আমার তাতে কিছুই যায় আসে না। মুখের ওপর থেকে তোমায় মুখোসটা সরিয়ে ফেলতে হবে। আসল চেহারাটা আমি দেখতে চাই।

কিন্তু আমি মুখোস খুলব কি করে ? আমার হাত দুটো যে ওপর দিকে তোলা।

মৃদু হেসে অরুণকুমার বললেন, একটা সমস্যা বটে। আমারও তো হাত দুটো জোড়া। একহাতে টর্চ আর এক হাতে রিভালবার। এক হাতে ঢাল, আর এক হাতে তরওয়াল। একেবারে নিধিরাম সর্দার, —এখন লড়াই করি কোন্ হাত দিয়ে ? প্রয়োজন তৃতীয় ব্যক্তির। কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তি একমাত্র ভৃত্য মধুকে পাওয়া সম্ভব। কিন্তু এখান থেকে হাঁকডাক করে মধুর ঘুম ভাঙানো যাবে না। অতএব আমাকেই খুলতে হবে মুখোস। টর্চটা মাটিতে নামিয়ে রাখছি। কিছুমাত্র চালাকি করবার চেষ্টা কোরো না যেন। মনে রেখো, চালাকি করতে গেলে এই রিভলভার অগ্নি উদ্‌গীরণ করতে মুহূর্তমাত্র দ্বিধা করবে না।

মনে মনে খুশি হয়ে উঠল ছায়ামূর্তি ! ঠিক এমনি একটা সুযোগের অপেক্ষাই করছিল। অত্যন্ত সজাগ আর সতর্ক হয়ে দাঁড়াল সে।

টর্চটা মাটিতে রাখতে গিয়ে অরুণকুমার বোধ হয় মুহূর্তের জন্যে ছায়ামূর্তির উপর থেকে তাঁর দৃষ্টি সরিয়ে নিয়েছিলেন। সেই সুযোগ গ্রহণ করল ছায়ামূর্তি। ঘটনাটা ঘটে গেল অভাবিত ভাবে। মুহূর্তের মধ্যে প্রচণ্ড বেগে একটা ঘুষি মারল সে অরুণকুমারের ডান হাতে। আকস্মিক আঘাতে অরুণকুমারের হাত থেকে রিভালভারটা ছিটকে পড়ল বেশ খানিকটা দূরে। ঝাঁপিয়ে পড়ল সে অরুণকুমারের উপর।

ছায়ামূর্তির কাছে হার স্বীকার করতে হল অরুণকুমারকে। দরজার ঝুলন্ত পর্দার সাহয্যে ওঁকে বেঁধে ফেলল সে।

তারপর বন্দী অরুণকুমারকে শোবার ঘরের মধ্যে ঠেলে দিয়ে বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ছায়ামূর্তি এবার নিশ্চিন্ত হয়ে এগিয়ে গেল বড় টেবিলের কাছে। সাগ্রহে গ্লোবটা নিয়ে আস্তে আস্তে ঘোরাতে লাগল। ঘোরাতে ঘোরাতে এক সময় গ্লোবের জোড়-মুখে হাত পড়ল। সঞ্চারিত হল ক্ষীণ আশার আলো তার মনে।

জোড়-মুখটা খোলবার চেষ্টা করল সে। কিন্তু নানান্ ভাবে চাপ দিয়ে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, বহু চেষ্টা করা সত্ত্বেও খোলা গেল না।

আবার ধীরে ধীরে সে ঘোরাতে লাগল গ্লোবটা।

সহসা থমকে থেমে গেল ছায়ামূর্তির হাত। সংযত হল মনের সমস্ত চিন্তা। তার সতর্ক কানে অতি মৃদু একটা শব্দ ধরা পড়েছে এতক্ষণে, শব্দ এত মৃদু যে সাধারণ কানে সেই শব্দ ধরা পড়া অসম্ভব।

আবার, আবার ধীরে ধীরে সে ঘোরাতে লাগল। তার হাত কাঁপতে লাগল আবিষ্কারের উত্তেজনায়। শব্দটা হয়ত কিছুই নয়, কিংবা অনেক কিছু হতে পারে। আবার এমনও হতে পারে—গ্লোবটা মেরুদণ্ডের ওপর ঘুরতে গিয়ে অমন একটা শব্দ হয়েছে। কিন্তু মৃদু শব্দের অত সহজ একটা মীমাংসা মেনে নিতে রাজি হল না তার মন। সম্পূর্ণ একটা নতুন চিন্তা দানা বেঁধে উঠছে তার মাথায়।

আগের থেকে আরো ধীরে, বারবার ঘোরাতে লাগল গ্লোবটা। বারকয়েক ঘোরাতেই আবার কানে ধরা পড়ল সেই রহস্যময় শব্দ।

ছায়ামূর্তি বুঝতে পারল, কয়েকবার ঘোরার পর গ্লোবটা মেরুদণ্ডের কোন একটা বিশেষ জায়গায় এসে পড়লে শব্দটা হয়।

এবার উল্টো দিকে ঘোরালো সে সতর্ক হয়ে। গ্লোবের বিশেষ একটা অংশ মেরুদণ্ডের কাছে আসতেই মৃদু শব্দ শোনা গেল।

জয়ের আনন্দে উত্তেজিত হয়ে উঠল ছায়ামূর্তি।

পরীক্ষা চলল আবার। সোজা আর উল্টো দিকে ঘুরিয়ে সে পাঁচটি বিন্দু আবিষ্কার করল। সেই বিন্দু ক'টি যখনই ঘুরতে ঘুরতে মেরুদণ্ডের উপর এসে পড়ে তখনই হয় সেই রহস্যময় শব্দ।

গ্লোবের জোড়-মুখে সিন্দুকের মত কম্বিনেশন লক লাগান আছে। সোজা আর উল্টো দিকে কয়েকবার ঠিকমত ঘোরাতে পারলে জোড়-মুখের লক্ খুলে যাবে।

প্রায় পনের মিনিটের চেষ্টায় জোড়-মুখ খুলতে পারল সে। খোলের ভিতরে দেখা গেল গ্লোবের সমান সমান একটা তুলোর বল।

বলটা টেনে বার করল ছায়ামূর্তি। তুলোর ভাঁজ খুলতেই বেরিয়ে পড়ল লাল শঙ্খ।

তখন অনেক রাত।

শঙ্খটা নিয়ে বেরিয়ে গেল সে।

মিনিট কয়েক পরেই ছায়ামূর্তি আর মলয়কে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল জঙ্গল-কুঠির দোতলার আলোকিত হল-ঘরে।

মলয় জিজ্ঞাসা করল, সফল হয়েছিস তাপস ?

হ্যাঁ। তাপস সমস্ত ঘটনা খুলে বলল।

১৫

সেদিন রাতের অভিযানের পর এক সপ্তাহ কেটে গেছে।

বদ্ধ ঘরের নিভৃতে এ-কদিন তাপস শুধু লাল শঙ্খটাকে পরীক্ষা করেছে নানান ভাবে। কিন্তু শঙ্খ-রহস্যের মূল রহস্য এখনও উদ্‌ঘাটন করতে পারে নি সে। তাই সকাল না হতেই আবার মনোযোগ দিয়েছে রহস্যের কিনারায়।

অবশ্য তাপস এটুকু বুঝতে পেরেছে—আসল রহস্য লুকিয়ে আছে শঙ্খের উপর উৎকীর্ণ চিত্রগুলির মধ্যে।

পরীক্ষা করে তাপস আরও জানতে পেরেছে শঙ্খটার আসল রং লাল নয়। অতি সাধারণ একটা বড় সাইজের শ্বেত শুভ্র শঙ্খে লাল রং করা। এত সুন্দর আর নিখুঁত ভাবে রং লাগান হয়েছে যে আসল রংটা বোঝা রীতিমত কষ্টসাধ্য।

অনেকগুলি প্রশ্ন একসঙ্গে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে তাপসের মনে। প্রত্যেকটি প্রশ্ন গভীর ভাবে চিন্তা করে দেখেছে সে। কিন্তু কোন প্রশ্নের সঠিক উত্তর এখনও খুঁজে পায় নি। গুপ্তধনের কিংবদন্তীর কাহিনী যে সত্য, এ বিষয়ে এতটুকু সন্দেহ নেই তার মনে এখন আর।

সকল প্রশ্নের উপর একটা প্রশ্ন শুধু বড় হয়ে জাগছে—বসন্ত রায় সাদা শঙ্খের উপর লাল রং করলেন কেন?

এর একটি মাত্র উত্তর হতে পারে—শঙ্খের উপর উৎকীর্ণ চিত্রগুলি সুন্দর দেখাবে বলে। লালের উপর কালো রং খোলে ভাল।

কিন্তু শুধু কি তাই?

আবার এমনও তো হতে পারে—লাল রঙের নীচে শুভ্র শঙ্খের উপর বসন্ত রায় খোদাই করে গেছেন রত্ন-সিন্দুকের গুপ্ত ঠিকানা। আর লাল রং দিয়ে ঢেকে দিয়েছেন সেই গোপন তথ্য।

বসন্ত রায়ের চিঠি কিন্তু বলে অন্য কথা—'শঙ্খে উৎকীর্ণ চিত্রগুলির নীরব ভাষা বোঝবার চেষ্টা কর, রত্ন-সিন্দুকের সন্ধান পাবে।'

শঙ্খের উপরের চিত্রগুলি প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা ভাবে পরীক্ষা করে দেখেছে তাপস। কিন্তু শঙ্খের উপর উৎকীর্ণ চিত্রগুলির মধ্যে একমাত্র হাতুড়ী ও ছেনির সাহায্যে খোদাই কর্মরত শিল্পীর চিত্রটি ছাড়া অন্য চিত্রগুলি কোন কিছুরই আভাস দেয় না।

খোদাই কর্মরত শিল্পীর দৃষ্টিকোণ দিয়ে বসন্ত রায় কি নির্দেশ করতে চান?

একখানা পাথরের উপর ছেনি ও হাতুড়ীর ঘায়ে শিল্পী তার মানসকে বাস্তবে উপস্থিত করে। দেয় রূপ, দেয় আকৃতি। রেখায় রেখায় বুলিয়ে দেয় প্রাণের পরশ। স্বপ্ন সত্য হয়ে ওঠে।

তবে কি বসন্ত রায় বলতে চান, ছেনি ও হাতুড়ীর ঘা দিয়ে দেখ, স্বপ্ন সফল হবে—সত্য হবে, পাবে রত্ন-সিন্দুকের সন্ধান, সার্থক হবে সব পরিশ্রম?

গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়ল তাপস।

এভাবে কতক্ষণ কেটেছে তাপসের খেয়াল নেই। সুজিতের ডাকে সে যেন ফিরে এল চিন্তাজগৎ থেকে বাস্তব জগতে।

ঘুমুচ্ছিলি? জিজ্ঞাসা করল সুজিত।

ঘুম? কই, না তো।

চোখ বুজে বসে বসে কি হচ্ছিল তবে?

ধ্যান করছিলুম। হাসল তাপস।

রত্ন-সিন্দুকের?

রত্ন-সিন্দুকের গোপন রহস্য গোপনই থাক আপাততঃ। সকালে পেটে চা না পড়লে আমার আবার মেজাজের ঠিক থাকে না। চল্।

উত্তম প্রস্তাব। আমারও চায়ের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তবে চা-পর্বটা এখানেই সেরে নিলে আমার একটু সুবিধে হত। মলয়কে ডাক্, আর এখানেই চা দিতে বল।

অল্পক্ষণ পরে তাপস বলল, শাঁখটার আসল রং লাল নয়। নিখুঁত করে শাঁখে লাল রং দিয়েছেন বসন্ত রায়। লাল রঙের নীচে রত্ন-সিন্দুক সম্পর্কে নিশ্চয় কোন গোপন তথ্য লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

তাপস ঠিক করলে, শঙ্খের উপর থেকে লাল রং তুলে দেখবে আসলে কি নির্দেশ দেওয়া আছে ওটার উপরে। সঙ্গে সঙ্গে রং তোলার কাজে লেগে গেল। শঙ্খের উপর কয়েক স্থানে চুণ আর সোডা মেশানো তরল পদার্থ তুলির সাহায্যে লাগিয়ে দিল। তারপর অত্যন্ত সতর্ক হয়ে পরিস্কার কাপড় দিয়ে মুছে তুলতে লাগল শঙ্খের উপরের লাল রং। যে জায়গাগুলোতে চুণ আর সোডা মেশানো তরল পদার্থ লাগান হয়েছিল, সেখান থেকে লাল রং উঠে গিয়ে শঙ্খের আসল রং বেরিয়ে পড়ল।

লেন্সটা চোখের সামনে ধরে শঙ্খের উপর ঝুঁকে পড়ল তাপস। অনেকক্ষণ ধরে চলল পরীক্ষা।

অবশেষে লেন্সের উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে বলল, এদিকে আয় মলয়! লেন্সের ভেতর দিয়ে দেখ একবার এখানটায়।

লেন্সের ভিতর দিয়ে শঙ্খের নির্দিষ্ট স্থানে দৃষ্টিপাত করল মলয়।

সাদা স্পটের মধ্যে কিছু লক্ষ্য করছিস? জিজ্ঞাসা করল তাপস।

মলয় উত্তর দিল, সাদা স্পটের ওপর খুব সরু একটা ফাটলের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। আর দেখে আশ্চর্য হচ্ছি, ফাটলটা সরল রেখায় তৈরী, আঁকাবাঁকা নেই কোথাও।

মৃহু মৃহু হাসতে লাগল তাপস। তারপর শঙ্খটা কাছে নিয়ে তুলির সাহায্যে ছকের ভিতরের পুরো রংটাই তুলে ফেলল।

এবার লেন্স নিয়ে উৎসুকভাবে দৃষ্টিপাত করল শঙ্খের উপর।

কিছুক্ষণ পরে লেন্সটা মলয়কে দিয়ে সে বলল, এবার দেখ।

খানিক পরে লেন্স থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে মলয় অবাক হয়ে তাকাল তাপসের দিকে।

কি রে, কি হোলো? জিজ্ঞাসা করল।

ফাটলটা আর সরল রেখা নেই—একটা চৌকো দাগে পরিণত হয়েছে। বিস্মিত কণ্ঠে মলয় বলল।

১৬

বিস্মিত মলয়ের দিকে তাকিয়ে তাপস হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করল,—শঙ্খের উপর চৌকো দাগটার কোন অর্থ বুঝতে পারলি ?

কিছুমাত্র না।

আবার ভালো করে দেখ—কিছু বুঝতে পারিস কিনা।

তাপস লক্ষ্য করল, ওর মুখের ভাব ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে।

তাপস জিজ্ঞাসা করল, কি, বুঝতে পারলি কিছু ?

চৌকো দাগটা শুধু দাগ নয়। ছোট্ট একটা টালির মত অংশ কেটে শঙ্খের ওপরে এত নিখুঁত ভাবে বসান হয়েছে যে, প্রথমে বুঝতে পারি নি—ওটা চৌকো দাগ ছাড়া অন্য কিছু। এতক্ষণে তফাতটা ধরা পড়ল। আসলে ঐ চৌকো টালিটা অন্য শঙ্খ থেকে কেটে লাল শঙ্খের ওপর বসান হয়েছে। তাই তো ?

খুশি হয়ে তাপস বলল, হ্যাঁ।

সুজিত জিজ্ঞাসা করল, শঙ্খের উপর চৌকো টালিটা জুড়ে দেওয়ার অর্থ কি ?

তাপস বলল, অর্থ কিছু একটা আছে বই কি। আমার মনে হয় বসন্ত রায় টালিটার উল্টো পিঠে রত্ন-সিন্দুকের সংকেতলিপি খোদাই করে রেখে গেছেন।

তোর অনুমান সত্যি কিনা, টালিটা খুললেই বোঝা যাবে।

তা অবশ্য যাবে। কিন্তু চতুর বসন্ত রায়ের চাতুর্যের জট অত সহজে খোলা যাবে না, সুজিত। অত্যন্ত সাবধানে একটি একটি করে

গ্রন্থি খুলতে হবে। তবে হতাশ হবার কোন কারণ নেই। আমার ধারণা, বসন্ত রায়ের রত্ন-সিন্দুক নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। আজই হোক আর কালই হোক। সেই রহস্যময় সংকেতের সন্ধান আমি পেয়েছি।

রত্ন-সিন্দুক পাবার সম্ভাবনায় খুশি হয়ে উঠল ওরা।

শঙ্খ পরীক্ষার আনুমানিক ফল পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝিয়ে বলতে লাগল ওদের কাছে তাপস, চিত্রগুলি পরীক্ষা করতে গিয়ে প্রথমেই নজর পড়ল খোদাইরত শিল্পীর চিত্রটির ওপরে। বর্ডারের দুধারে মাঝামাঝি জায়গায় কর্মরত শিল্পীর দুটি চিত্র আঁকা আছে। দুটিরই বিষয়বস্তু এক। শিল্পী একটা চৌকো পাথরের ওপর ছেনি আর হাতুড়ীর সাহায্যে খোদাই করে বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টা করছে তার কল্পনার মূর্তিকে'। চিত্র দুটিরই বিষয়বস্তু যদিও এক, কিন্তু তবু কর্মরত শিল্পীর হস্তচালনার কৌশল দেখান হয়েছে দুটি চিত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। ডানদিকের চিত্রে দেখান হয়েছে, শিল্পী চৌকো পাথরের ড়ানধারের কোণে ছেনি সোজা রেখে হাতুড়ীর আঘাত করছে, আর বাঁ দিকের চিত্রে ওই পাথরের ডানদিকের কোণে ছেনির মুখ রেখে আর ছেনির মাথাটা নীচের দিকে হেলিয়ে নীচের দিক থেকে হাতুড়ীর আঘাত করছে। মনে হয়, শিল্পীর হস্ত চালনার কৌশল নিপুণভাবে প্রয়োগ করতে পারলে টালিটা খুলবে।

মলয় বলল, তাই যদি হয় তো শুভ কাজে বিলম্ব কেন?

আমারও তাই ইচ্ছে, যন্ত্রপাতিগুলো বের কর, দেখি কি হয়।

হাতুড়ী আর ছেনি নিয়ে এল মলয়।

তাপস অত্যন্ত সতর্ক হয়ে টালির নীচের অংশে ডানদিকের কোণে ছেনির মুখ রেখে, দুবার হাতুড়ীর ঘা দিল। হাতুড়ীর দ্বিতীয় আঘাত পড়তেই উপর দিকের জোড়ের মুখটা উঁচু হয়ে উঠল।

ফল কি দাঁড়ায় দেখবার জন্যে মলয় আর সুজিত উদগ্রীব হল।

তাপসও যথেষ্ট উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তবু নীরবে সে কি যেন চিন্তা করতে লাগল।

ছুরির ফলার সাহায্যে শঙ্খের উপর থেকে টালিটা খুলে নিতেই তাপসের নজরে পড়ল একটা ছোট্ট তামার মাদুলি, জোড়া আছে টালিটার উল্টো পিঠে। মাদুলিটা খুলে নিয়ে সে দেখল মাদুলির একটা মুখ মোম দিয়ে আঁটা। সেই মুখটা খুলতেই দেখা গেল মাদুলির ভিতরে এক টুকরো ভাঁজ করা কাগজ রয়েছে। কাগজটা বের করে ভাঁজ খুলে চোখের সামনে মেলে ধরল।

কাগজের উপর স্পষ্ট অক্ষরে কয়েক ছত্র লেখা রয়েছে :

"অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এতদূর পৌঁছিয়াছ। সফলতা লাভ করিবেক—সন্দেহ নাই। রত্ন-সিন্দুকের কাহিনী কল্পনা নহে—সত্য। যে তীক্ষ্ণবুদ্ধি তোমাকে এতদূর টানিয়া আনিয়াছে, সেই বুদ্ধিই তোমাকে গুপ্তধনের সন্ধান দিবেক।

আশীর্ব্বাদ রহিল।" —বসন্ত রায়

১৭

বসন্ত রায়ের লেখা ছোট্ট চিঠিটার দিকে তাকিয়ে তাপস বসে রইল অনেকক্ষণ। লেখাগুলোর উপর বার বার দৃষ্টি বুলোতে লাগল।

মলয় আর সুজিত আকুল আগ্রহ নিয়ে তাকিয়েছিল তাপসের দিকে। কিন্তু তাপসের মুখ দিয়ে কোন কথাই বেরুল না।

সময় কাটতে লাগল নিঃশব্দে।

উস্‌খুস্‌ করতে লাগল সুজিত। তাপসের মুখ থেকে কিছু একটা শোনার আগ্রহে অস্থির হয়ে উঠল সে। অবশেষে জিজ্ঞাসা করল, কি লেখা আছে ওতে? গুপ্তধনের ঠিকানা?

নড়েচড়ে বসল তাপস। তারপর নিঃশব্দে লেখা কাগজের টুকরোটা এগিয়ে দিল সুজিতের দিকে। বলল, পড়ে দেখ।

এক নিঃশ্বাসে লেখাটা পড়ে ফেলল সুজিত। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে চিঠিটা এগিয়ে দিল তাপসের দিকে। বলল, আবার সেই হতাশা! মায়ামৃগের মরীচিকা!

মৃদু মৃদু হাসতে লাগল তাপস। বলল, হতাশ হবার মত কিছু দেখছি নে আমি। বরং দেখতে পাচ্ছি আশার নতুন আলো।

সুজিত বলল, পাইলেও পাইতে পার অমূল্য রতন।

সুজিতের বিদ্রূপ গায়ে মাখল না তাপস। বলল, আশা মানুষকে সফলতার পথে এগিয়ে দেয়। চিঠিটা মলয়কে দিয়ে বলল, দেখ কিছু বুঝতে পারিস কিনা।

মলয় চিঠিটা নিয়ে শূন্য-দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল লেখাগুলোর দিকে।

মলয়ের ভাবান্তর লক্ষ্য করল তাপস।

জিজ্ঞাসা করল, কিছু বুঝলি ?

কিছুমাত্র না।

কিছুই লক্ষ্য করলি নে ?

অন্য চিঠির সঙ্গে এ চিঠিটার কিছু পার্থক্য আছে এই যা ! কিন্তু তার সঙ্গে গুপ্তধন-রহস্যের সম্পর্ক কোথায় বুঝতে পারছি না।

সম্পর্ক নিশ্চয়ই আছে, আর সেটা এত সূক্ষ্মভাবে আছে যা তোর আমার চোখে এখনও ধরা পড়ছে না। তবু চিঠিটার মধ্যে নূতনত্ব কি দেখলি, বল তো ?

বসন্ত রায় এই চিটিটা সাধারণ কালি দিয়ে না লিখে, লিখেছেন গাঢ় কালি দিয়ে যাতে লেখাগুলো অস্পষ্ট না হয়ে যায়। কিন্তু তিনি যদি এতই সাবধানী তবে আগের চিঠিটা সাধারণ কালিতে লিখলেন কেন ? সেটাও তো এই রকম কোনও কালি দিয়ে লিখতে পারতেন।

ঠিক। ঠিক এই একই সন্দেহ হয়েছে আমারও। অবশ্য এর পেছনে আর একটা সম্ভাবনা আছে। সেটা সত্যি কিনা আমি এখনি একবার পরীক্ষা করে দেখতে চাই। শুধু এক গামলা জল দরকার।

তাপস বসন্ত রায়ের লেখা চিঠিটা গামলার জলে ফেলে রাখতে কয়েক মিনিটের মধ্যে সেটা সম্পূর্ণ ভিজে গেল। ভিজে কাগজের উপর ধীরে ধীরে ফুটে উঠল কয়েক ছত্র লেখা। তারপর জল থেকে চিঠিটা তুলে নিয়ে আলোর দিকে মেলে ধরল। ততক্ষণে বেশ কয়েক ছত্র লেখা ফুটে উঠেছে। খুব স্পষ্ট, জলছাপের মত।

উদ্বেগাকুল তাপসের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল আনন্দধ্বনি, পেয়েছি। বসন্ত রায়ের রত্ন-সিন্দুকের কাহিনী স্বপ্ন নয়, সত্যি।

তারপর ?

তারপর সময় এগিয়ে গেছে অনেকটা। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে এসে ক্রমশঃ বিলীন হয়ে গেল মধ্যরাত্রির ঘন অন্ধকারে। সেই অন্ধকারে নীচের খোলা বারান্দায় চুপ করে বসেছিল তাপস। মনে তার দারুণ উত্তেজনা। রত্ন উদ্ধারের সময় আসন্ন। এখনি বেরুতে হবে।

বাগানের দিকে মৃদু পায়ের খস্ খস্ শব্দ শোনা গেল।

অন্ধকারে দৃষ্টি প্রসারিত করল তাপস। দৃষ্টিপথে ধরা পড়ল দুটি চলন্ত ছায়ামূর্তি। নিঃশব্দে এল তারা। সুজিত আর মলয়।

জিজ্ঞাসা করল তাপস, বোটে যন্ত্রপাতি সব তোলা হয়েছে ?

হ্যাঁ।

জলের ধারেই বাঁধা ছিল ছোট্ট বোটটা।

তিনজনে জলটুঙ্গিতে যাবার জন্যে বোটে উঠল। লোহার চেনে মৃদু টান দিতেই বোট তরতর করে এগিয়ে চলল জলটুঙ্গির দিকে।

জলটুঙ্গি পেরিয়ে ঘরে ঢুকল তারা।

বসন্ত রায়ের চিঠির নির্দেশ মত পূর্ব দিকের দেয়ালে বসান একটা আলমারির সামনে এসে দাঁড়াল তাপস। পাশেই দেয়ালে আটকান রয়েছে চারটি দীপাধার—ব্রোঞ্জের পরী-মূর্তি। ডান দিক থেকে তিন নম্বর পরীটিকে চেপে ধরে ঘোরাতেই দেয়াল-আলমারি একপাশে সরে যেতে দেয়ালের খানিকটা অংশ ফাঁকা হয়ে গেল।

টর্চের আলো ফেলে সুজিত চাপা গলায় বলে উঠল, গুপ্ত-পথ !

আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভেতরটা দেখতে লাগল তাপস। বলল, হ্যাঁ, গুপ্ত-পথ। পথের সন্ধান পাওয়া গেল, এবার রত্ন-সিন্দুকের সন্ধান পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই।

নির্দেশমত ঘরের বাইরে গভীর অন্ধকারে মলয় অদৃশ্য হয়ে গেল নিঃশব্দে। আর সুজিতকে সঙ্গে নিয়ে তাপস দেয়ালের ফাঁকের মধ্যে প্রবেশ করল। দেখা গেল, ঘোরানো সিঁড়ি ধাপের পর ধাপ নীচে

নেমে গেছে। শেষ ধাপ এসে মিশেছে পাথরের বড় টালি দিয়ে গড়া সুড়ঙ্গ-পথে। পথটা শেষ হয়েছে মাটির নীচে বড় এবং ভারী পাথরে গড়া একটা চৌকো ঘরে।

মাটির নীচের বদ্ধ হাওয়ায় আর ভাপ্‌সা গন্ধে ওদের নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল।

তাপস প্রথমে ঢুকল ঘরে। তারপর সুজিতকে বলল, গাঁইতি আর কোদাল নিয়ে আয়, আলো ছুটো জ্বালিয়ে দে।

আলো জ্বালাতে দিনের আলোর মতই আলোকিত হয়ে উঠল ছোট ঘরটি। ঘরের ঠিক মাঝখানে সাত ফুট পরিমাণ স্থানে খড়ি দিয়ে বিরাট একটা চৌকো দাগ কাটল তাপস। তারপর বলল, এই হচ্ছে বসন্ত রায়ের নির্দিষ্ট স্থান। এখানে মাটির নীচে আছে মতিলালের কঙ্কাল আর রত্ন-সিন্দুক। ওপরের পাথরগুলো খুলে ফেল আগে। এরপর মাটি খুলতে হবে।

সুজিত কাজে হাত দিলে। একটার পর একটা টালি খুলতে লাগল গাঁইতির সাহায্যে। কিন্তু এ রকম কাজে সুজিত একটুও অভ্যস্ত নয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল!

টালির কোণায় গাঁইতির চাড় দিয়ে একটা টালি তুলে তাপস বলল, এর নীচে থেকে ছ'হাত মাটি তুলতে হবে। সেখানেই আছে মতিলালের মৃতদেহ আর রত্ন-সিন্দুক।

কিছুক্ষণের চেষ্টায় উপরের বাকি টালিগুলো সব তুলে ফেলল তাপস। তারপর টালির নীচের নরম মাটি কোপাতে লাগল বিপুল উদ্যমে। মাটিগুলো তুলে উপরে ফেলতে লাগল সুজিত।

দেখতে দেখতে প্রায় একঘণ্টা কাটল।

ক্রমে আরও একটা ঘণ্টা কেটে গেল। ততক্ষণে প্রায় ছয় ফুট সমান চৌকো গর্ত খোঁড়া হয়ে গেছে।

সহসা সুজিত কোদালটা একপাশে রেখে খোলা মাটি হাতড়াতে লাগল। তারপর চাপা কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল, আলোটা নিয়ে আয় তাপস, আমার হাতে কি যেন একটা ঠেক্‌ছে।

তাপস জোরাল আলোটা নামিয়ে ধরল গর্তের মধ্যে। আলোকিত হয়ে উঠল ভিতরটা।

উজ্জ্বল আলোয় বিস্মিত তাপস আর সুজিত দেখল নরম মাটির বুকে জেগে উঠেছে মানুষের পায়ের কঙ্কাল।

কয়েকটি নিঃশব্দ মুহূর্ত। দু'জনেই স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

মৃদুকণ্ঠে তাপস বলল, হতভাগ্য মতিলালের কঙ্কাল।

সুজিত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। অতীতের সেই রহস্যময় কাহিনীর কথাই বোধ হয় চিন্তা করছিল সে।

তাপস আবার বলল, এবার অত্যন্ত সাবধানে মাটি খুঁড়তে হবে। যথা সময়ে ধীরে ধীরে গোটা নর-কঙ্কালটা দেখা গেল নরম মাটির বুকে। দেহের একটি হাড়ও স্থানচ্যুত হয় নি!

কঙ্কালের মাথার নীচের মাটি সরিয়ে ফেলতেই পাওয়া গেল ছোট্ট একটি লৌহ-সিন্দুক।

উত্তেজিত সুজিত স্থান-কাল ভুলে চীৎকার করে উঠল, বসন্ত রায়ের রত্ন-সিন্দুক!

তাপস কোন উত্তর দিল না, নীরবে দেখতে লাগল সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য। মর্মান্তিক গুরুগম্ভীর হৃদয়স্পর্শী দৃশ্য—অত্যন্ত ভয়াল ভয়ঙ্কর। মাটির বুকে রত্ন-সিন্দুকের উপর মাথা রেখে যে নর-কঙ্কাল যখের মত রত্ন-সিন্দুকটা আগলে দু' শ' বছর ধরে নিঃশব্দে শুয়ে আছে—একদিন তার প্রাণ ছিল। পাপের রক্তাক্ত পথে সঞ্চয় করেছিল প্রচুর ধনরত্ন। আর ধনরত্নের মতই তিলে তিলে সঞ্চয় করেছিল পাপ। রক্তের বদলে রক্ত দিয়েই তাকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল শেষে।

তাপসকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখে সুজিত জিজ্ঞাসা করল, কি ভাবছিস, তাপস ?

কিছু না। আয়, সিন্দুকটা টেনে তুলি ওপরে।

ঠিক সেই মুহূর্তে নিঃশব্দ-রাত্রির স্তব্ধতাকে মুখর করে ঘোষিত হল রিভলভারের সশব্দ গর্জন।

১৮

সচমকে ঘুরে দাঁড়াল তাপস। কয়েক মুহূর্ত কি যেন চিন্তা করে নিল। তারপর শক্ত করে রিভলভারটা চেপে ধরে দ্রুতপদে উপরে উঠে গেল সুড়ঙ্গ-পথ দিয়ে।

উপরে উঠে জলটুঙ্গির ঘরে এসে তাপস টর্চ জ্বালল।

দেখল, কালো কম্বল-চাপা সংগ্রামরত শত্রুকে মেঝের উপর চেপে ধরে বসে আছে মলয়।

তাপসকে দেখে মলয় হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, আয়, এটাকে বেঁধে ফেলি আগে, তারপর সব শুনিস।

একটা মোটা দড়ির সাহায্যে কম্বলচাপা লোকটাকে বেঁধে ফেলল।

তারপর মলয় বলল, তোর অনুমান ঠিক, তাপস। অরুণকুমারের সজাগ দৃষ্টি ছিল আমাদের ওপর। তোর নির্দেশ মত দড়ির ফাঁদ পেতে অন্ধকারে গোপনে পাহারা দিচ্ছিলাম। সতর্ক দৃষ্টি ছিল হলুদ-কুঠির দিকে। কিছুক্ষণ আগে অন্ধকারে অরুণকুমারকে দেখলাম, জলটুঙ্গির দোরে এসে দাঁড়াতে। ভেতরে পা দিতেই ফাঁদে আটকে অরুণকুমার মেঝের ওপর ছিট্‌কে পড়ল। ওর হাতের রিভলভারটাও ছিট্‌কে পড়ে সশব্দে গর্জন করে উঠল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়লাম ওর ওপরে।—কিন্তু তোদের খবর কি ?

ছোট্ট কথায় উত্তর দিল তাপস, শুভ।

একটু থেমে তাপস বলল, ঘরের দোর-জানলাগুলো বন্ধ করে একটা আলো জ্বালা। আমি আসছি এখনি।

তাপস আবার দেয়ালের ফাঁকে সুড়ঙ্গ-পথে প্রবেশ করল।

প্রায় দশ মিনিট পরে তাপস এল সুজিতকে নিয়ে। ঘরে ঢুকে প্রথমে সুড়ঙ্গ-পথের মুখ বন্ধ করে দিল। তারপর অরুণকুমারকে টেনে তুলে একটা চেয়ারে বসিয়ে বাঁধন খুলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, তারপরে! অরুণবাবু, কি মনে করে?

অরুণকুমার করুণদৃষ্টি মেলে তাপসের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার প্রয়োজনটা তো আপনার অজানা নেই, তাপসবাবু!

তা অবশ্য আমার জানা আছে। কিন্তু আপনার কি ধারণা, আজ রাতে আমরা জলটুঙ্গিতে এসেছি রত্ন-সিন্দুকের সন্ধানে?

আমার তো অনুমান তাই। গাঁইতি, কোদাল, মাটি খোঁড়ার নানান্ যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম সঙ্গে নিয়ে মাঝরাতে লোকে আর কি উদ্দেশ্য নিয়ে জলটুঙ্গিতে আসবে?

আপনার অনুমান সত্যি। কিন্তু আপনি তো জানেন, বসন্ত রায়ের রত্ন-সিন্দুকের কাহিনী সত্যি নয়।

রত্ন-সিন্দুকের অনুসন্ধান করতে গিয়ে বার বার হতাশ হয়ে আমার অন্ততঃ তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু আপনি আমার সেই ধারণা পালটে দিয়েছেন। কারণ রত্ন-সিন্দুকের কাহিনী যদি সত্য বলে বিশ্বাস না করতেন, তাহ'লে আপনি অন্ততঃ আমার বাড়ি থেকে গভীর রাতে লাল শঙ্খ চুরি করবার ঝুঁকি নিতেন না।

একটু চুপ করে থেকে তাপস আবার জিজ্ঞাসা করল, আপনার কি ধারণা—আমি রত্ন-সিন্দুকের সন্ধান পাব?

আমার দৃঢ় ধারণা, আপনি রত্ন-সিন্দুক পেয়েছেন।

হঠাৎ আপনার এ ধারণা হল কি করে?

একটু আগে আপনি মলয়বাবুর প্রশ্নের উত্তরে তাকে জানালেন—সংবাদ শুভ।

ধরুন, আপনার অনুমান সত্যি—আমি রত্ন-সিন্দুক পেয়েছি। কিন্তু তাতে আপনি কি আশা করেন ?

'বিশেষ কিছু না। শুধু আমার পূর্বপুরুষ মতিলালের উত্তরাধিকারী হিসেবে, রত্ন-সিন্দুকের সঞ্চিত রত্নের অর্ধেক অংশ।

দু'শ' বছর পরে যে রত্ন-সিন্দুক সুজিত উদ্ধার করেছে—তার অর্ধেক ধনরত্ন আপনাকে দিতে রাজী হবে কেন সে ?

সুজিত-মামার অন্ততঃ রাজী হওয়া উচিত। কারণ সুজিত-মামা আর আপনি ভাল করেই জানেন যে, সিন্দুকে সঞ্চিত ধনরত্নের ওপর যতখানি অধিকার তাঁর আছে, ঠিক ততখানি অধিকার আমারও আছে।

কিন্তু ধরুন, আপনাকে যদি এখানে চিরদিনের মত মাটির নীচের অন্ধকারে এই গুপ্ত-কক্ষে বন্দী করে রাখা হয়, তাহলেও কি আপনি আপনার মতের পরিবর্তন করবেন না ?

আপনার কথা ঠিক বোধগম্য হল না, তাপসবাবু !

পরিষ্কার করে বলছি—শুনুন। আপনার পূর্বপুরুষ মতিলালকে যেমন মাটির নীচের গুপ্ত-কক্ষে সমাধি দেওয়া হয়েছিল—ঠিক সেখানেই যদি আপনাকে জীবন্ত সমাধি দেওয়া হয়, তাহলেও কি আপনি এই গুপ্ত ধনরত্নের অংশ দাবী করবেন ?

আমাকে জীবন্ত সমাধি দেওয়া আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না।

সম্ভব কেন হবে না, অরুণবাবু ? দু'শ' বছর আগের খোঁড়া মাটির নীচের গোপন কক্ষে মতিলালের কবরে আপনাকে জীবন্ত সমাধি দিলে কেউ টের পাবে না, আপনার কি হ'ল জানতেও পারবে না কেউ কোন দিন।

সব বুঝলাম, কিন্তু তবু বলছি তা সম্ভব হবে না কখনো।

১৯

তেমনি জোরের সঙ্গেই বলে চললেন অরুণকুমার, আপনারা আমাকে জীবন্ত সমাধি দিতে পারবেন না। আপনাদের শিক্ষা, আপনাদের রুচি, আপনাদের সংস্কার বাধা দেবে। কারণ, ডাকত সর্দার বসন্ত রায় আর অপনারা এক নন। তা ছাড়া···

তা ছাড়া কি?

তা ছাড়া—ধরে নিলাম, অসম্ভব যদি সম্ভবও হয়—আপনারা যদি সত্যিই আমাকে খুন করে মতিলালের গোপন কবরে মাটি চাপা দিয়ে রেখে দেন—তবু বসন্ত রায়ের মত রেহাই পাবেন না। কারণ, পুলিস আমার মৃতদেহকে গোপন কবর থেকে টেনে তুলবেই।

আপনি ভুলে যাচ্ছেন অরুণবাবু—দু'শ' বছর আগেও পুলিস ছিল, কিন্তু তারা শত চেষ্টা করেও মতিলালের মৃতদেহ আবিষ্কার করতে পারেনি।

আমি কিছুই ভুলিনি তাপসবাবু! কিন্তু সেদিনের পুলিস আর আজকের পুলিসের মধ্যে অনেক তফাৎ। তাছাড়া কাল সকালে আমি বাড়িতে অনুপস্থিত থাকলে পুলিস-সুপার অজয় মিশ্র সমস্ত সংবাদ পেয়ে যাবেন। কথাটা খুলেই বলি তাহলে। সম্ভব-অসম্ভব বিপদের সমস্ত রকম ঝুঁকি নিয়েই আমি এখানে পা বাড়িয়েছি। আমি জানি, আপনি শেয়ালের মত ধূর্ত। তাই আগে থেকে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করেছি। পুলিস-সুপার অজয় মিশ্র আমার বন্ধু। আগাগোড়া সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করে একটা সীলমোহর

করা খামের মধ্যে ভরে রেখেছি। খামটা দেওয়া আছে আমার এক বিশ্বস্ত ভৃত্যের কাছে, আর তাকে নির্দেশ দেওয়া আছে—যদি আগামীকাল সকালে আমাকে অনুপস্থিত দেখে, তাহলে তখন সে রওনা হবে পুলিস-সুপারের বাঙলোতে আর স্বয়ং অজয় মিশ্রের হাতে দেবে সেই সীলমোহর করা চিঠিটা।

আর কিছু না বলে অরুণকুমার শুধু মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে তাপস বলল, আপনার বুদ্ধির প্রশংসা করছি অরুণবাবু! আপনাকে আর একটা প্রশ্ন করব।

বেশ তো।

দৃঢ়কণ্ঠে তাপস জিজ্ঞাসা করল, সুজিতের বদলে যদি আপনি রত্ন-সিন্দুক উদ্ধার করতেন—দিতেন কি অর্ধেক অংশ, সুজিতকে?

নিশ্চয়। আগেই বলেছি—বসন্ত রায়ের রত্ন-সিন্দুকের ওপর আমার যতখানি অধিকার আছে, ঠিক ততখানি অধিকার আছে সুজিত-মামার। ন্যায়সংগত অধিকারকে আমি অস্বীকার করব কেন? অবশ্য এই ভাগ-বাটোয়ারা সম্পর্কে মনে মনে একটা পরিকল্পনা খাড়া করেছি। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, আমার সেই পরিকল্পনা মেনে নিতে বাধ্য করতাম সুজিত-মামাকে।

বিস্মিত হল তাপস। জিজ্ঞাসা করল, আপত্তি না থাকে তো আপনার পরিকল্পনার কথা খুলে বলুন।

আপনি জানেন তাপস বাবু, বসন্ত রায়ের রত্ন-সিন্দুকের কাহিনী যদি সত্য হয়, তাহলে ধরে নেওয়া চলে সিন্দুকের ভিতরে আছে লক্ষ লক্ষ টাকার হীরা জহরৎ। সেই সঞ্চিত হীরা জহরৎ সৎপথে উপার্জন করেননি বসন্ত রায় আর মতিলাল। চুরি-ডাকাতি-লুঠ আর খুন-খারাপির রক্তাক্ত পথে সঞ্চিত হয়েছে সেই সমস্ত ধনরত্ন। কাজেই অসৎপথে যে ধনরত্ন উপার্জিত হয়েছে সে ধনরত্নকে ব্যয় করতে হবে

সং পথে। আর এই নিয়ে মনে মনে সৃষ্টি করেছি এক পরিকল্পনা। সত্যই আমি যদি রত্ন-সিন্দুক উদ্ধার করতে পারতাম তাহ'লে সিন্দুকে সঞ্চিত ধনরত্নের অর্ধেক ব্যয় করতাম সৎ কাজে আর অর্ধেক সমান অংশে ভাগ করে নিতাম আমি আর সুজিত-মামা। সঞ্চিত ধনরত্নের অর্ধেক বিক্রী করে যে টাকা পেতাম, সেই টাকায় গরীব-দুঃখীদের বিনা পয়সায় চিকিৎসার জন্যে গড়ে তুলতাম এক আধুনিক হাসপাতাল আর সেখানে প্রথম দান হিসাবে আমি আমার হলুদ-কুঠির বাইরের মহলের সবটাই দান করতাম। হাসপাতালের নামকরণ করা হত বসন্ত রায় আর মতিলালের নাম অনুসারে।

তাপস বলল, সত্যি, চমৎকার পরিকল্পনা, সুষ্ঠু এবং সুচিন্তিত। এক্ষেত্রে আমি যদি সুজিত হতুম, তাহলে আপনার পরিকল্পনাকে কার্যকরী করতুম।

অরুণকুমার বললেন, আমি যা বলেছি এর প্রতিটি কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। এখন বিশ্বাস করা না করা আপনাদের ইচ্ছাধীন।

সুজিত এতক্ষণ সবই শুনছিল। এবার বলল, অরুণের পরিকল্পনা এবং ইচ্ছা আমার মনে ধরেছে। চমৎকার আইডিয়া। কিন্তু যার দ্বারা অসম্ভব সম্ভব হল, যে উদ্ধার করল রত্ন-সিন্দুক—তার অংশে যে একেবারে শূন্য পড়ছে! তার জন্যে একটা কিছু ব্যবস্থা করা দরকার।

সুজিতের কথায় সবাই একসঙ্গে হেসে উঠল।

হাসি থামিয়ে অরুণকুমার বললেন, আমার আর আপনার অংশ থেকে সমান অংশে কিছুটা বিয়োগ করে তাপসবাবুর শূন্য অংশটা ভরাট করা হোক।

সুজিত বলল, অতি উত্তম প্রস্তাব। আমি সানন্দে সমর্থন করছি।

গম্ভীর কণ্ঠে তাপস জিজ্ঞাসা করল, আমরা আপনাকে বিশ্বাস করতে পারি তো, অরুণবাবু?

অরুণকুমার সহাস্য দৃষ্টি তুলে ধরলেন তাপসের পরীক্ষারত দৃষ্টিপথে। জিজ্ঞাসা করলেন, আমার ওপর এখনও বিশ্বাস জন্মায়নি, তাপসবাবু ?

তীব্র পরীক্ষকের দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল তাপস অরুণকুমারের দিকে। তার দৃষ্টির তীব্রতা ধীরে ধীরে কমে এল, সহজ হয়ে এল কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সে।

তাপস দৃঢ়পদে এগিয়ে গেল দেয়ালের ধারে, পরী-মূর্তিগুলির সামনে। পরী-মূর্তি শক্ত করে চেপে ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খুলে দিল গুপ্ত-পথের দ্বার। বলল, অরুণবাবু, সুজিতের সঙ্গে গিয়ে আপনাদের পূর্বপুরুষের রত্ন-সিন্দুকটি নিয়ে আসুন।

রত্ন-সিন্দুক তুলে নিয়ে আসার পর নানান্ যন্ত্রপাতির সাহায্যে সেটা খোলা হল।

গভীর আগ্রহ আর উত্তেজনা নিয়ে সবাই ঝুঁকে পড়ল সিন্দুকের উপরে।

সিন্দুকের ভিতরে দেখা গেল একতাল তুলো।

তুলোর অবরণ সরিয়ে দিল তাপস।

ঘরের তীব্র আলোয় ঝল্‌মল্ করে উঠল শত-শত হীরার ঝলক।